H2 OTEP.82P/T-3

একটি উজ্জ্বল অধ্যায়

(ব্র্যাকের প্রথম জাতীয় কর্মসূচীর কাহিনী)

উৎসর্গ

ওটেপের পাইলট প্রকল্পে যে সকল মহিলা কর্মী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ও ওটেপ চলাকালীন অবস্থায় যে সকল কর্মী ভাই ও বোনেরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের নামে উৎসর্গ করছি আমার এই ক্ষুদ্র দলিলটি।

মুখবন্ধ

এ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্র্যাক বিশ বছরে পদার্পণ করল। এই বিশ বছরে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এবং হাটি হাটি পা পা করে ব্র্যাক অনেকদূর এগিয়ে গেছে। দেশে এবং বিদেশে ব্র্যাক অনেক সুনাম ও সম্মান অর্জন করেছে। আজ দেশে এবং দেশের বাইরে ব্র্যাক একটি অতি সুপরিচিত নাম। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে ব্র্যাকের এই পরিচিতি, সুনাম ও সম্মানের পিছনে আশি দশকের সাড়া জাগানো জাতীয় কর্মসূচী ওটেপের অবদান অনেক। এই ওটেপ কর্মসূচীটি সেই সময় ব্র্যাকের জন্য ছিল একটা চ্যালেঞ্জস্বরূপ। ব্র্যাক সেই চ্যালেঞ্জকে খুব সুন্দরভাবে মোকাবিলা করে কর্মসূচীটি সফলভাবে বাস্তবায়িত করেছিল। ধাপে ধাপে ব্র্যাক কর্মসূচীর বিভিন্ন দিকের উন্নয়ন সাধন করে, সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে।

এই বইটিতে লেখক তার অভিজ্ঞতার ডালি থেকে এক এক করে সাজিয়ে কর্মসূচীটির ক্রম বিকাশ, সংগঠন তৈরী ও ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগুলো খুবই সুন্দরভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ে কোন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন করতে চাইলে কি কি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নজর রাখা দরকার তার একটি একটি স্পষ্ট ধারণা এ বই থেকে পাওয়া যাবে। আমি আশা করি এ বই পড়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে নিবেদিত কর্মী ও সংস্থা বিশেষ দিক নির্দেশ লাভ করতে পারবে।

ব্র্যাকের বহুমুখী কর্মসূচীর অভিজ্ঞতাকে সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপনার প্রয়াস এটাই প্রথম। আমি এজন্য লেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করি লেখকের এই উদ্যোগ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মীকে তাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে অন্যের কাছে তুলে ধরতে উৎসাহিত করবে। এভাবেই একে অপরের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে তা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজে লাগাতে পারে।

ফজলে হাসান আবেদ
নির্বাহী পরিচালক
ব্র্যাক

মুখবন্ধ

উন্নয়নের জগতে লিপিবদ্ধকরণ (Documentation) একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতাসমূহকে অন্যের নিকট অতি সহজে তুলে ধরা যায়। উন্নয়ন জগতে বাংলাদেশে যে হাজার হাজার কর্মী কাজ করছে তারা যদি তাদের স্ব স্ব অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে পারত তাহলে উন্নয়নের অনেক সঠিক মত, পথ ও দিক নির্দেশনা পাওয়া যেত; অন্যের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যেত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে যাদের অভিজ্ঞতা সব চাইতে বেশী অর্থাৎ মাঠ কর্মীরা যারা প্রতিনিয়ত গ্রাম ও গ্রামের মানুষের কাছ থেকে উন্নয়ন, উন্নয়নের ধারা, কলাকৌশল ও উন্নয়ন কর্মসূচী সম্পর্কে বিভিন্ন ধ্যান ধারনা পাচ্ছে তারা তা লিপিবদ্ধ করছে না। কারণ হিসেবে তাদের বক্তব্য তারা কাজে কর্মে এত ব্যস্ত থাকে যে এ সব মূল্যবান অভিজ্ঞতাসমূহ লিপিবদ্ধ করার সময় তাদের নাই। সেদিক থেকে বিচার করলে এই বইয়ে লেখকের এই উদ্যোগ বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। এখানে ব্র্যাকের আশি দশকের সাড়া জাগানো জাতীয় কর্মসূচী ওটেপের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। এই বইয়ে লেখক তার অভিজ্ঞতার ভান্ডার থেকে এক এক করে সাজিয়ে এ কর্মসূচীটির ক্রমবিকাশের বিভিন্ন ধাপ উপস্থাপন করেছেন। আমি আশাবাদী যে অভিজ্ঞতায় ভরপুর এই বইটি পড়ে যে কোন উন্নয়ন কর্মী কিছু শিখতে পারবে এবং তা কাজে লাগিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সাহায্য করতে পারবে।

ব্র্যাকে কর্মসূচীর অভিজ্ঞতার পূর্নাঙ্গ প্রকাশ এই প্রথম। আমি আশা করি যে লেখকের এই উদ্যোগ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মীকে উৎসাহিত করবে তাদের অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করে অন্যের কাছে তুলে ধরতে। তাহলে আমরা একে অপরের কাছ থেকে কিছু জানতে ও শিখতে পারব এবং তা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের কাজে লাগাতে পারব।

ফজলে হাসান আবেদ
নির্বাহী পরিচালক
ব্র্যাক

ভূমিকা

১৯৮০-এর দশকে ওটেপ ছিল ব্র্যাকের এক সাড়া জাগানো কর্মসূচী। ওটেপ বা ডায়রিয়া প্রতিরোধক কর্মসূচীর মাধ্যমেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্র্যাকের পরিচিতির সূচনা। আজ সাফল্যের শিখরে দাড়িয়ে পেছনে ফেরার তাগিদ বা প্রয়োজন কেউ আর ততটা অনুভব করে না। ধীরে ধীরে ব্র্যাকের ভিতরে এবং বাইরের লোকজন ওটেপের কথা ভুলে যাচ্ছে। ব্র্যাকের বর্তমান প্রজন্ম ওটেপকে শুধুমাত্র অতীতের একটি কর্মসূচী বলেই জানে। এ কর্মসূচীর ঐতিহাসিক পটভূমি, বিন্যাস, কর্মপদ্ধতি, একটি নতুন প্রকল্পের সাফল্যের জন্য কর্মীদের ত্যাগ ও পরিশ্রম, নুতন নতুন সঙ্কট ও সে সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার দৃঢ়তা সম্পর্কে তারা অবগত নয়। আরো দশ বছর পর অর্থাৎ ২০০০ সালে যে নতুন প্রজন্ম ব্র্যাকে আসবে ও কাজ করবে তারা হয়ত ওটেপের নামই শুনবে না। যে কর্মসূচীটি ব্র্যাককে সকলের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেল সে নিজে কালের অতল গহ্বরে বিলীন হয়ে যাবে। তাই ওটেপ যাতে হারিয়ে না যায়, স্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে না যায় এবং নতুন প্রজন্মের কাছে যাতে মাথা উঁচু করে দাড়াতে পারে তার জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। একথা প্রত্যয়ের সাথে বলা যায় যে ওটেপের শিক্ষাসমূহ বর্তমান ও আগামী দিনের উন্নয়ন কর্মীদের যে কোন পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

১৯৯২ সালে অর্থাৎ প্রায় ১২ বছর পর এই প্রমাণ দলিলটি লিখতে যেয়ে অনেক ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তির সাহায্য নিতে হয়েছে। স্মৃতি কখনো কখনো প্রতারক। তাই কোথাও হয়ত তথ্যগত ত্রুটি থেকে যেতে পারে। যদি এ ধরণের কোন ত্রুটি কোন পাঠকের কাছে ধরা পড়ে তা সংশোধন করার জন্য লেখককে জানানোর অনুরোধ রইলো।

এই দলিলটি তৈরী করার জন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন ফজলে হাসান আবেদ অর্থাৎ আমাদের শ্রদ্ধেয় আবেদ ভাই যার সুযোগ্য নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল এই সাড়া জাগানো কর্মসূচীটি। এ ছাড়া বিশেষভাবে তথ্যগত দিক থেকে যাদের কাছ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি তারা হচ্ছেন ডঃ মোশতাক রেজা চৌধুরী, মুশফিকুর রব চৌধুরী, ফজলুল করিম, তপন ব্রহ্ম, মিলন বড়ুয়া, শাহজাহান চৌধুরী ও রফিকুল হাওলাদার। লেখাটি সম্পাদনা করে যারা সাহায্য করেছেন তারা হচ্ছেন মোঃ আইয়ুব হোসেন ও রঞ্জনেশ্বর হালদার। দলিলে পরিবেশিত ছবিগুলো পুরনো নথিপত্র থেকে সরবরাহ করে সাহায্য করেছেন জালাল আহমেদ। এ ছাড়া ওটেপের সংরক্ষিত সব পুরানো কাগজপত্র ও রিপোর্ট সরবরাহ করে সাহায্য করেছেন শিরীন সুলতানা। দলিলটি মুদ্রণের জন্য ব্র্যাকের কম্পিউটার বিভাগের সাথে যোগাযোগ ও অন্যান্য লজিষ্টিক সাহায্য দিয়েছেন মোশাররত জাহান। এদের এই সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া এই দলিলটি বের করা সম্ভব হত না। এদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই দলিলটির উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। নতুন প্রজন্ম এই লেখা পড়ে যদি ব্র্যাকের ইতিহাসের একটি অংশ জানতে পারে এবং কর্মসূচী পরিচালনার বিভিন্ন খুটিনাটি বুঝতে পারে তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

তারিখ : এপ্রিল, ১৯৯২

সুখেন্দু কুমার সরকার
কর্মসূচী পরিচালক
ব্র্যাক

সূচীপত্র

বিষয়	পাতা
১। কর্মসূচীর ধারণা ও তার বিশ্লেষণ	১
২। প্রস্তাবিত কর্মসূচী ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ	২
৩। পরীক্ষামূলক প্রকল্প	৪
৪। ওটেপের প্রথম ধাপ	
-- কর্মসূচীর উন্নয়ন	৮
-- সাংগঠনিক উন্নয়ন	১৮
-- ব্যবস্থাপনা ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির উন্নয়ন	২২
৫। ওটেপের দ্বিতীয় ধাপ	২৬
৬। শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচী	৩২
৭। ওটেপ কার্যক্রমের ফলাফল	৩৪
৮। ওটেপের অবদান	৩৫
৯। সংযোজনীসমূহ	

১ -- বাংলাদেশের মানচিত্র

২.১ - ২.৪ -- ডায়রিয়া ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে মনে রাখার দশটি পয়েন্ট।

৩ -- ওটেপ নর্মস।

৪ -- গ্রাম্য চিকিৎসক সেমিনার।

৫ -- Check list for Area Manager.

৬ -- ওটেপ কর্মসূচীর উপর লিফলেট

৭ -- ইপিআই কার্যক্রমে ব্র্যাকের ভূমিকা।

৮ - ১২ -- রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত বার্তা সমূহ।

১৩ -- পোষ্টার

১৪ -- ORW's Monthly Salary Calculation Sheet.

১৫ -- ORW Activity Monitoring Form.

১৬ -- স্বাস্থ্যকর্মীর কার্যক্রম ফলাফল।

১৭ -- শিক্ষাদানের মাসিক পরিসংখ্যান।

১৮ -- ওটেপ কার্যক্রমের ফলাফল।

১৯ -- পাইলট প্রকল্পের কর্মীদের তালিকা।

২০ -- List of Technical Advisory Committee.

একটি উজ্জ্বল অধ্যায়

সূচনা :

১৯৭৮ সাল। তখন আমি ব্র্যাকের শাল্লা প্রকল্পের প্রকল্প প্রশাসক। প্রকল্পের মাসিক সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য নির্বাহী পরিচালক ফজলে হাসান আবেদ অর্থাৎ আমাদের আবেদ ভাই তখন প্রতি মাসে শাল্লা প্রকল্পে যেতেন। তিনি সাধারণতঃ যেতেন সভার একদিন আগে এবং সভা শেষে আরো ২-৩ দিন থাকতেন। ঐ ২-৩ দিন তিনি বিভিন্ন গ্রামে যেতেন কাজ দেখার জন্য। সভার আগের দিন উনি সাধারণতঃ প্রকল্পের খবরাখবর ও বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে আমাদের সাথে আলাপ করতেন। খুব সম্ভব ১৯৭৮ সালের শেষের দিকে কোন এক মাসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর মূল কারণগুলো কি কি এবং কি ধরনের কর্মসূচী হাতে নিলে শিশু মৃত্যুর হার কমানো যেতে পারে?" ঠিক সেই সময়ে আমার কারণগুলো জানা ছিল না। তাই আমি কিছুটা হকচকিয়ে গেলাম। আবেদ ভাই তখন তাঁর চিন্তা ভাবনা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, শিশু মৃত্যুর অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে মূল কারণগুলো হচ্ছে ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, অপুষ্টি ইত্যাদি। এর মধ্যে আবার ৫ বছরের নীচে বেশী শিশু মারা যায় ডায়রিয়ার কারণে। তাই আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর হার কমাতে হলে ডায়রিয়া প্রতিরোধে কার্যকর কিছু একটা করা উচিত।

কর্মসূচীর ধারণা ও তার বিশ্লেষণ : (নভেম্বর--ডিসেম্বর ১৯৭৮)

আবেদ ভাই-এর সাথে আমিও একমত পোষন করলাম যে ডায়রিয়া প্রতিরোধের জন্য একটা কিছু করা উচিত। তখন প্রশ্ন উঠল কি করা যেতে পারে! প্রথমে এ সম্পর্কে উনি বললেন যে বিভিন্ন উপায়ে ডায়রিয়ার উপর কাজ করা যেতে পারে। যেমন--

১. রোগ হলে ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করানো।

২. রোগের প্রধান উৎস পানি নিয়ন্ত্রণ করা। অর্থাৎ জনগণ যাতে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতে পারে তার জন্য প্রতি গ্রামে যথেষ্ট সংখ্যক নলকূপ বসানো।

৩. প্রচুর পরিমাণে প্যাকেট স্যালাইন বাজারজাতকরণ যাতে ডায়রিয়া হলে জনগণ বাজার থেকে প্যাকেট কিনে তা ব্যবহার করতে পারে।

৪. জনগণকে ডায়রিয়া বিষয়ে শিক্ষা দেয়া যেন ডায়রিয়া হলে সহজপ্রাপ্য উপকরণ দিয়ে ঘরে তৈরী করা যায় এমন স্যালাইন দ্বারা জনগণ ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ও ডায়রিয়াজনিত মৃত্যু রোধ করতে পারে।

এরপর উনি বললেন, "এ ব্যাপারে তোমরা চিন্তাভাবনা কর। পরবর্তী মাসে আমি আবার এ ব্যাপারে তোমাদের সাথে আলাপ করব।"

পরবর্তী মাসে শুরু হল প্রতিটা প্রস্তাবের উপর বিশ্লেষণমূলক আলোচনা। প্রথম প্রস্তাবে দেখা গেল প্রতিটা গ্রামে ডাক্তার দিয়ে ডায়রিয়ার চিকিৎসা করানোর মত ব্যবস্থা বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে অনুপস্থিত। ফলে প্রথম প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে গেল। দ্বিতীয় প্রস্তাব বিশ্লেষণের সময় শাল্লা প্রকল্পের ল্যাট্রিন কর্মসূচী এবং ঐ এলাকার অকেজো টিউবওয়েলগুলোর অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হল। শাল্লাতে বেশ কিছু ল্যাট্রিন বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল। কিন্তু জনগণ তা ব্যবহার করেনি। পায়খানা করার ব্যাপারে তারা তাদের পূর্বের অভ্যাসই বজায় রাখে। তাছাড়া যে সকল টিউবওয়েল নষ্ট হয়ে গেছে বা টিউবওয়েলের মাথা চুরি হয়ে গেছে জনগণ তা আর মেরামত করেনি। তারা বরং হাওড়ের পানি খায়। এ থেকে শিক্ষণীয় ব্যাপার হল যে শুধুমাত্র জিনিষের সরবরাহ নিশ্চিত করলেই জনগণ তা ব্যবহার করবেনা যদি না সে ব্যাপারে তারা সচেতন হয় এবং তার উপকারিতা বুঝতে পারে। ফলে দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুযায়ী নলকূপে সরবরাহ করলে যতদিন নলকূপগুলো ঠিক থাকবে ততদিন হয়ত জনগণ বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করবে। কিন্তু নলকূপগুলো অকেজো হয়ে গেলে আর ঠিকমত মেরামত হবে না এবং জনগণ বিশুদ্ধ পানিও পান করবেনা। আবার তারা পূর্বের অভ্যাসে ফিরে যাবে। এই বিশ্লেষণের পর দ্বিতীয় প্রস্তাবও বাতিল হয়ে গেল।

এবার বিশ্লেষণ শুরু হল তৃতীয় প্রস্তাব নিয়ে। এক্ষেত্রেও দেখা গেল বেশ কিছু সমস্যা। যেমন, যে পরিমাণে প্যাকেট স্যালাইন দরকার সে পরিমাণ প্যাকেট বাংলাদেশে প্রস্তুত হয় না। অপরপক্ষে, প্যাকেটে প্রস্তুত প্রণালীর যে নির্দেশাবলী লেখা থাকে তা দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত হওয়ার জন্য পড়তে পারবেনা এবং সব শেষ অসুবিধা হল গ্রামেগঞ্জের দোকানগুলোতে এত প্যাকেট সরবরাহ নিশ্চিত করা। ফলে, এতসব সমস্যার জন্য তৃতীয় প্রস্তাবও বাতিল হয়ে গেল।

সবশেষে আলোচনা শুরু হল চতুর্থ প্রস্তাব নিয়ে। দেখা গেল প্রস্তাবটি তেমন কিছুই না এটি একটি শিক্ষা কার্যক্রম। এবং আরও দেখা গেল মুখে খাবার স্যালাইন তৈরী করার জন্য যে প্রয়োজনীয় উপাদান যেমন পানি, লবণ ও গুড় তা বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি ঘরেই পাওয়া যায়। এবং এ বিষয়টিও আলোচিত হয় যে শিক্ষা যদি সঠিকভাবে প্রদান করা যায় এবং উপাদানগুলো যদি ঘরে থাকে তাহলে বাচ্চাদের ডায়রিয়া হলে লোকজন তা ব্যবহার করবে এবং তা থেকে উপকার পাবে।

প্রস্তাবিত কর্মসূচী ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ : (জানুয়ারী--জুন ১৯৭৯)

এই চারটি প্রস্তাব বিশ্লেষণের পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ব্র্যাক ডায়রিয়ার উপর শিক্ষাদান কার্যক্রম হাতে নেবে যাতে করে ডায়রিয়া হলে জনগণ ঘরে বসে মুখে খাওয়ার স্যালাইন বানিয়ে খাওয়াতে পারে এবং ডায়রিয়ার কবল থেকে শিশুদের মৃত্যু রোধ করতে পারে।

এই শিক্ষা কার্যক্রমকে নিয়ে তখন বেশ কিছু প্রশ্ন দেখা দিল। প্রশ্নগুলো হল, শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে? কাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে? কারা শিক্ষা দিবে? শিক্ষাদানের পদ্ধতি কি হবে? লবণ, গুড় এবং পানির পরিমাণ কতটুকু হবে? ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর আবেদ ভাই সে যাত্রায় এ ব্যাপারে আলোচনা শেষ করে আমাকে এসব ব্যাপারগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে বললেন এবং

উনি পরবর্তী মাসে এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত আলোচনা করার আগ্রহের কথা জানালেন।

পরের মাসে শুরু হল বিস্তারিত আলোচনা। শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে আলোচনা হল তা হচ্ছে যেহেতু ডায়রিয়াতে বেশীরভাগ শিশু মারা যায় পানিশূন্যতার জন্য। আর পানিশূন্যতা রোধের জন্য দরকার রোগীকে লবণ-গুড়ের স্যালাইন খাওয়ানো। তাই শিক্ষার বিষয়বস্তুতে কিভাবে লবণ-গুড়ের স্যালাইন বানাতে হয় তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাছাড়া ডায়রিয়া হলে রোগী অপুষ্টিতে ভোগে। ডায়রিয়া চলাকালীন এবং ডায়রিয়ার পরে যাতে রোগী অপুষ্টিতে না ভোগে তার জন্য পুষ্টি সম্পর্কীয় কিছু শিক্ষা বিষয়বস্তুতে থাকতে হবে। সবশেষে মত প্রকাশ করা হয় যে রোগ হওয়ার চেয়ে না হওয়াটা ভাল। তাই শিক্ষার বিষয়বস্তুতে রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে কিছু তথ্য থাকা উচিত।

শিক্ষা দিতে হবে কাদের। এ পর্যায়ে আলোচনায় দেখা গেল যে আমাদের দেশে বাচ্চাদের অসুখ-বিসুখ হলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মা যত্ন নিয়ে থাকে। বাবা সাধারণতঃ ঘরের বাইরে অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকে। তাছাড়া, বাবার চেয়ে মার রোগ প্রতিরোধ ও পুষ্টিবিষয়ক জ্ঞান বেশী থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুত ও পুষ্টিকর খাবার পরিবেশন করাও মায়ের দায়িত্ব। তাই সিদ্ধান্ত হয় যে প্রতিঘরে কমপক্ষে একজন মা অথবা মা হওয়ার যোগ্য সক্ষম মহিলাকে ডায়রিয়ার উপর শিক্ষা প্রদান করতে হবে। যে মহিলা মা হওয়ার যোগ্য সে যখন ভবিষ্যতে মা হবে তখন এই শিক্ষা কাজে লাগাতে পারবে।

এরপর আসে শিক্ষাদান পদ্ধতি। রেডিওর মাধ্যমে করা হবে নাকি গ্রামে একটা মিটিং ডেকে সবাইকে একসাথে শেখাতে হবে, নাকি প্রতিটা মহিলাকে আলাদা আলাদা ভাবে শেখাতে হবে। রেডিওর বিপক্ষে মতামত আসে যে গ্রামে অনেকের বাড়ীতেই রেডিও নেই। তাছাড়া গ্রামের লোকজন সাধারণতঃ রেডিওতে গান এবং নাটক শুনে থাকে। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান শুরু হলে রেডিও বন্ধ করে রাখে। তাছাড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সঠিকভাবে লবণ-গুড় স্যালাইন বানানো শেখানো। যাতে প্রয়োজনে মায়েরা সঠিকভাবে স্যালাইন বানিয়ে রোগীকে খাওয়াতে পারে। কোন অবস্থাতেই রেডিওর মাধ্যমে গ্রাম্য মহিলাদের স্যালাইন বানানো শেখানো সম্ভব নয়। ফলে রেডিওর প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রামে মিটিং ডেকে সবাইকে একসাথে শেখানো। এখানেও সমস্যা দেখা দিল যে সবাইকে একসাথে আনা এবং শেখানো সম্ভব কিনা। তাছাড়া এ ধরনের সভায় যেহেতু হাতে-কলমে সবাইকে দিয়ে লবণ-গুড়ের স্যালাইন বানানো যাবে না তাই প্রয়োজনে সবাই সঠিকভাবে স্যালাইন তৈরী করতে পারবে না। তাই সিদ্ধান্ত হয় যে বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে প্রতিটা মহিলাকে আলাদাভাবে শেখাতে হবে।

কারা শিক্ষা দিবে ? অর্থাৎ কোন ধরনের কর্মী দরকার এই শিক্ষা কার্যক্রমে ! যেহেতু এই কার্যক্রমে লক্ষিত জনগোষ্ঠী মহিলা। তাছাড়া আমাদের দেশে মহিলারা বাইরের কোন পুরুষের সামনে সাধারণতঃ বেরোয় না। তাই সহজেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে মহিলাদের শেখানোর জন্য দরকার মহিলা কর্মী।

শিশু মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে ডায়রিয়ার উপর যে কার্যক্রম নেয়া হবে সে ব্যাপারে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার পর প্রশ্ন উঠল এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের। সবার আগে যেটি বাস্তবায়িত হওয়া দরকার তা হল কি কি বার্তা মায়েদের কাছে পৌঁছাতে হবে। অর্থাৎ কর্মীরা কি কি বিষয় মায়েদের শেখাবে। এ ব্যাপারে আবেদ ভাই একটি কমিটি গঠন করেন যার দায়িত্ব ছিল শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণ এবং সুনির্দিষ্ট বার্তা তৈরী করা। ঐ কমিটিতে একজন বিদেশী ডাক্তারও ছিলেন। তার নাম ছিল টেড ভিনসেনট এলারব্রুক। উনি তখন শাল্লা প্রকল্পের মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ঐ কমিটির একজন সদস্য হিসেবে মুশফিকুর রব চৌধুরীও (বর্তমান আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক) ছিলেন। শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করার জন্য প্রয়োজন হয় বিষয়বস্তুর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার। কিছু বিষয়বস্তু তৈরী করে ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তা পরীক্ষা করা হয় শাল্লা প্রকল্পের হরিনগর ও আনন্দপুর গ্রামে। এই খসড়া বার্তা ঐ দুই গ্রামের সকল মায়েদের নিকট পৌঁছানো ও সে সম্পর্কে ফিড-ব্যাক দেয়ার কাজে নিয়োজিত ছিল হেমলতা সরকার ও স্বপ্না ভৌমিক। তারা দুইজনই ঐ এলাকার বাসিন্দা ছিল। ঐ দুই গ্রামের শিক্ষাপ্রাপ্ত মায়েদের বানানো স্যালাইন ডায়ালে সংগ্রহ করে কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরীর পরীক্ষাগারে (বর্তমানে আইসিডিডিআরবি) পরীক্ষা করা হয়। এবং এ পরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন বিদেশী ডাক্তার টেড এবং শাল্লা প্রকল্পের প্যারামেডিক্স জয়নাল আবেদীন (বর্তমানে সে ব্র্যাকে নেই)। ঐ দুই মহিলা কর্মীর ফিড-ব্যাক ও কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরীর পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে কমিটি "মনে রাখার মত ১০টি পয়েন্ট" (সংযোজনী-২.১) নামে সুনির্দিষ্ট ১০টি বার্তা তৈরী করে। পরবর্তী মাসে বার্তাগুলো নিয়ে শাল্লাতে আবেদ ভাইয়ের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সেগুলোকে চূড়ান্ত রূপ দেয়া হয়।

পরীক্ষামূলক প্রকল্প : (জুলাই ১৯৭৯ -- মে ১৯৮০)

এরপর সিদ্ধান্ত হয় দেশব্যাপী এই কার্যক্রম চালানোর পূর্বে শাল্লাতে পরীক্ষামূলকভাবে কার্যক্রমটি চালানো উচিত। পরীক্ষামূলক প্রকল্পের মাধ্যমে কতগুলো বিষয় সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা যাবে, যথা বার্তাগুলো ঠিক আছে কিনা, গ্রামের মহিলারা শিক্ষাটা কতটুকু মনে রাখতে পারে, সঠিকভাবে তারা লবণ-গুড় স্যালাইন তৈরী করতে পারে কিনা, তৈরীকৃত স্যালাইনে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত উপাদানসমূহ সঠিক অনুপাতে থাকে কিনা, ডায়রিয়া হলে জনগণ তা ব্যবহার করে কিনা, মহিলা কর্মীদের দ্বারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে কাজ করা সম্ভব কিনা, শেখানোর পদ্ধতি কি হবে ইত্যাদি। যেহেতু শাল্লা একটি হাওড় এলাকা তাই জুন--জুলাই মাসের দিকে নৌকায় করে কাজ করা সুবিধা। কারণ ঐ সময় ঐ এলাকার গ্রামগুলো ছাড়া বাকী সবকিছু থাকে পানির তলায়। তাই সিদ্ধান্ত হয় যে ১৯৭৯ সনের জুলাই মাসে শাল্লাতে পরীক্ষামূলক প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। ঐ সময় আবেদ ভাইয়ের একটি প্রস্তাব আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছিল। তাঁর প্রস্তাব ছিল, "বর্ষাকালে গস্তি নৌকা ভাড়া করে দিব। নৌকাতে মহিলা কর্মীরা থাকবে, খাবে ও ঘুমাবে এবং নৌকাতে করে গ্রামে গ্রামে গিয়ে মায়েদের শিক্ষা দিয়ে আসবে।" আমাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করলেন "কি পারবে না ?" সত্যি কথা বলতে কি ঐ সময় এটাকে আমার কাছে একটি বাস্তবসম্মত প্রস্তাব বলে মনে হয়নি। যেখানে গ্রামে মহিলা কর্মী দেখলে জনগণ বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে সেখানে

কিভাবে নৌকায় মেয়েরা রাত কাটাবে এবং গ্রামে গিয়ে শিক্ষা দিবে। পরে অবশ্য বর্ষাকালে পত্তি ছেই দেয়া নৌকা ভাড়া করা হত। এবং তা করা হত মহিলা কর্মীদের থাকা ও ঘুমানোর জন্য নয়। পত্তি নৌকাতে করে কর্মীরা গ্রামে গ্রামে যেয়ে মায়েদের শিক্ষা দিত।

পরীক্ষামূলক প্রকল্প শুরুর আগে আরো দুটি বিষয়ের উপর সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। একটি হচ্ছে মহিলা কর্মীদের বেতন কিভাবে নির্ধারিত হবে? অপরটি হচ্ছে কাজের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য মনিটরিং-এর পদ্ধতি কি হবে? বেতন সম্পর্কে আবেদ ভাই প্রস্তাব করলেন যে বেতন কাজের মান অনুসারে নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ মায়েদের শিক্ষা দেয়ার গুণগত মানের উপর নির্ভর করে মহিলা কর্মীদের বেতন নির্ধারিত হবে। আলোচনার পর বেতন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয় যে মায়েরা ১০টি পয়েন্ট কতটা মনে রাখতে পেরেছে এবং লবণ-গুড় স্যালাইন সঠিকভাবে বানাতে পারে কিনা তা মনিটরিং-এর মাধ্যমে জেনে মহিলা কর্মীদের বেতন নির্ধারিত হবে। ফলে বেতন নির্ধারণের জন্য মহিলা কর্মীদের কাজকে চারটি গ্রেডে ভাগ করা হয়। যে দশটি বার্তা মায়েদের শেখানো হয়েছে সেখান থেকে মনিটররা মায়েদের প্রশ্ন করত এবং শেখানো বার্তাগুলোর কতটা মনে রাখতে পেরেছে তা যাচাই করত এবং মনে রাখা অনুসারে নম্বর দিত। যদি কোন শিক্ষাপ্রাপ্ত মা ১০টি পয়েন্টই মনে রাখতে পারে এবং সঠিকভাবে লবণ-গুড় স্যালাইন বানাতে পারে তাহলে গ্রেড এ, যদি ৭-৯$\frac{1}{2}$ পয়েন্ট পায় এবং সঠিকভাবে স্যালাইন বানাতে পারে তাহলে গ্রেড বি, যদি ৭-এর কম পায় কিন্তু স্যালাইন সঠিকভাবে বানাতে পারে তাহলে গ্রেড সি আর যদি সঠিকভাবে স্যালাইন বানাতে না পারে তাহলে গ্রেড ডি। প্রতি 'এ' গ্রেডের জন্য মহিলা কর্মী পাবে ৩ টাকা, গ্রেড বি-এর জন্য ২ টাকা, গ্রেড সি-এর জন্য ১ টাকা এবং গ্রেড ডি-এর জন্য কোন টাকা পাবে না।

একটু চিন্তা করলে দেখা যায় যে এই পদ্ধতিতে সবচাইতে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সঠিকভাবে স্যালাইন বানানোর উপর। কারণ কাজের মান নির্ণয়ের সময় দেখা যাচ্ছে কেউ হয়ত ১০টি পয়েন্টের সবকটিই জানে কিন্তু সঠিকভাবে স্যালাইন বানাতে পারেনা সেই মা গ্রেড ডি তে পড়বে এবং তার জন্য মহিলা কর্মী কোন পয়সা পাবেনা। সত্যিকার অর্থে সঠিকভাবে বানাতে পারাটাই এই কার্যক্রমে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ডায়রিয়া হলে মা যেন সঠিকভাবে স্যালাইন বানিয়ে খাওয়াতে পারে এবং ডায়রিয়াজনিত কারণে মৃত্যুহার রোধ করতে পারে।

গ্রামের মহিলারা যদিও সাধারণতঃ পুরুষদের সামনে বের হয় না তবুও মনিটরিং-এর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় যে যেহেতু এ কাজে খুব ঘোরাফিরা করতে হবে তাই এ কাজের জন্য পুরুষ কর্মী নিয়োগ করতে হবে। কারন মহিলা কর্মীদের পক্ষে অত ঘোরাফিরা করা সম্ভব না। আরো সিদ্ধান্ত হয় যে মহিলা কর্মীদের শেখানোর ১ মাস পরে মায়েদের মনিটরিং করতে হবে। মনিটরিং ডিজাইনিং পর্বে ফজলুল করিম (বর্তমানে রিসার্চ বিভাগে কর্মরত) ও জয়নাল আবেদীন ২ মাস শাল্লা থানায় কাজ করেন।

পরীক্ষামূলক প্রকল্পটি শুরুর আগে সিলেট জেলা থেকে ২০ জন মহিলা কর্মী নির্বাচন করা হয়। নির্বাচনের পর তাদের মার্কুলী শিবিরে ৬ দিনের এক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এটা ছিল তত্ত্বীয় এবং

হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে ২ দিন তাদের গ্রামে গিয়ে মায়েদের শিক্ষা দিতে হত। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে মহিলা কর্মীরা মার্কুলী শিবিরের পাশে উমরপুর গ্রামে মায়েদের শিক্ষা দিয়েছিল। প্রশিক্ষণ শেষে ২০ জন মহিলা কর্মী নিয়োগ করা হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে তাদের অধিকাংশরই ৮-১০ বছরের শিক্ষা ছিল (সংযোজনী-১৯) কিন্তু কেউই এস.এস.সি পাশ ছিল না। এই মহিলা কর্মীদের তখন বলা হত Oral Replacement Worker (ORW).

সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে শুরু হয় পরীক্ষামূলক প্রকল্প। এই প্রকল্পের নাম দেয়া হয় ওরাল থেরাপী প্রোগ্রাম (OTP)। শাল্লা প্রকল্পের শাল্লা থানার অন্তর্গত ৬টি ক্যাম্পে এই পরীক্ষামূলক প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। ক্যাম্পগুলো হল আটগাঁও, দাউদপুর, গোবিন্দপুর, আনন্দপুর, ঘুংগিয়ারগাঁও এবং শাসকাই। ক্যাম্পের আওতাধীন মায়েদের শেখানোর জন্য প্রতি ক্যাম্পে ৩-৪ জন করে ও.আর.ডাব্লিউ নিয়োজিত করা হয়। ও.আর.ডাব্লিউদের নেতৃত্বে ছিলেন ঐ সকল ক্যাম্পের ক্যাম্প-ইন-চার্জগণ। এই মুহূর্তে যাদের নাম মনে আসছে তারা হলেন আটগাঁও ক্যাম্পে শাহাবুদ্দিন আহমেদ (বর্তমানে এল.এফ.পি.ইতে কার্যরত), দাউদপুর ক্যাম্পে হালিম চৌধুরী, আনন্দপুরে আবুবকর সিদ্দিক, ঘুংগিয়ারগাঁও-এ আজিজুল করিম। শেষের ৩ জন কেউই ব্র্যাকে নেই। শাল্লা থানার কাজ শেষ হতে লাগে প্রায় ২ মাস। অর্থাৎ ১৯৭৯ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত শাল্লা থানাতে কাজ করা হয়। তারপর অক্টোবর মাস হতে বৃহত্তর সিলেট জেলার আজমিরীগঞ্জ ও বানিয়াচং এই ২টি উপজেলাতে পরীক্ষামূলক প্রকল্পের কাজ সম্প্রসারণ করা হয়। এই সম্প্রসারণের সময় ২টি টিম গঠন করা হয়। প্রতি টিমে নিয়োগ করা হয় ১৫-১৬ জন মহিলা কর্মী, ১ জন পুরুষ কর্মী ও ১ জন পাচক। টিমের প্রতিটা মহিলা কর্মী দিনে ১০ জন মহিলাকে শিক্ষাদান করত এবং হাতে-কলমে লবণ-গুড়ের স্যালাইন বানানো শেখাত। পুরুষ কর্মীদের কাজ ছিল নৌকায় মহিলা কর্মীদের সাথে যাওয়া এবং গ্রামে কখনও মহিলা কর্মীরা যদি অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং তারা যদি পুরুষ কর্মীদের সাহায্য চায় তখন তাদের সাহায্য করা। ফলে দেখা যেত মহিলা কর্মীদের গ্রামে পৌঁছে দেবার পর পুরুষ কর্মীর কোন কাজ নেই। নৌকায় ফিরে এসে শুধু বসে থাকতে হতো। সবাই সন্ধ্যার কিছু পূর্বে গ্রাম থেকে ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া করত। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর টিমে বসত ফিড-ব্যাক সভা। ঐ সভার শিক্ষা প্রদানের বার্তা, মহিলা কর্মীরা গ্রামে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে কিনা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হত। সভা চলত প্রায় রাত ১১-১২টা পর্যন্ত। তারপর প্রতিটা মহিলা কর্মীকে কমপক্ষে ১০টি করে "মনে রাখার মত ১০ পয়েন্ট" হাতে লিখে কপি করতে হত পরের দিন গ্রামে তা বিতরণের জন্য। দেখা গেছে এসব করে মহিলা কর্মীদের শুতে শুতে বাজত প্রায় রাত ২টা। কোন এক পর্যায়ে ফিড-ব্যাকের মাধ্যমে ১০ পয়েন্ট বেড়ে ১৯ পয়েন্টে দাড়ায় এবং মহিলা কর্মীরা তখন ঐ ১৯ পয়েন্টের উপরই শিক্ষাদান করেছে। পরবর্তীতে আবার এটা ১০ পয়েন্টে নিয়ে আসা হয়েছিল।

ফিড-ব্যাক সভার আলোচনায় দেখা গেল মহিলা কর্মীদের গ্রামে কাজ করতে বেশ কিছু অসুবিধা হয়। তাদের দেখলেই গ্রামের লোকজন মনে করে পরিবার পরিকল্পনার কর্মী। এখানে উল্লেখ্য যে

ঐ সময় শুধুমাত্র পরিবার পরিকল্পনার মহিলা কর্মী ছাড়া অন্য কোন মহিলা কর্মী সাধারণতঃ গ্রামে দেখা যেত না। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে লোকজনের স্বস্তিতস্বীও ভালো ছিলনা। এই অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে মহিলা কর্মীরা যে গ্রামে বা পাড়ায় কাজ করবে তার আগের দিন ঐ গ্রাম বা পাড়ার জনগণকে অবহিত করা হবে যে পরের দিন ব্র্যাকের কিছু মহিলা কর্মী তাদের গ্রাম বা পাড়ায় যাবে এবং ডায়রিয়ার উপর শিক্ষা প্রদান করবে। গ্রামে বা পাড়ায় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঐ তথ্য পুরুষদের জানানোর দায়িত্ব দেয়া হল পুরুষ কর্মীদের। এভাবে শুরু হয় পুরুষ কর্মীদের নৌকা থেকে গ্রামে গিয়ে কাজ করা।

পরীক্ষামূলক প্রকল্পের কাজ বৃহত্তর সিলেট জেলার ৩টি উপজেলাতে গোয়া, আজমিরীগঞ্জ এবং বানিয়াচংএ করা হয়। ৬৬২টি গ্রামের ৬৮ হাজার পরিবারে এক বছরে এই শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল।

প্রায় এক বছর পরীক্ষামূলক প্রকল্পের কাজ মনিটরিং-এর মাধ্যমে দেখা যায়, যে শিক্ষা মহিলা কর্মীরা মায়েদের দিচ্ছে তা মায়েরা মনে রেখে লবণ-গুড়ের স্যালাইন সঠিকভাবে বানাতে পারে এবং স্যালাইনে যে উপাদান যতটুকু পরিমাণে থাকা উচিত অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ঠিক থাকে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যাও দেখা যায়। প্রকল্পের সাফল্যের জন্য সমস্যাগুলোকে কাটিয়ে ওঠার দিকে নজর দেয়া হয়। শিক্ষাপ্রাপ্ত মায়েদের মধ্য থেকে ১০% মায়েদের নিয়ে দেখা হতো তারা যথাযথভাবে স্যালাইন বানাতে পারছে কিনা। ঐ সময় যে সমস্যাটি ধরা পড়ে তা হল মায়েরা গুড় এবং লবণের পরিমাণে বেশী ভুল করে। কারণ তখন শেখানো হত চার আঙ্গুলের প্রথম ভাঁজের সমান দুই মুষ্টি গুড় এবং এক চিমটি লবণ আধাসের পানিতে মিশানোর জন্য। মায়েরা প্রায়ই এই 'দুই' এবং 'এক'-এর মধ্যে গুলিয়ে ফেলতো। অর্থাৎ গুড় এবং লবণের পরিমাণে ওলট পালট হয়ে যেতো। কোন কোন শিক্ষাপ্রাপ্ত মা দুই মুষ্ঠি গুড়ের পরিবর্তে দুই মুষ্ঠি লবণ দিত। এটা নিয়ে তখন সবাই চিন্তিত ছিল যে এ ব্যাপারে কি করা যায়! পরীক্ষামূলক প্রকল্পে শুধুমাত্র ঐ একটি সমস্যা ছাড়া বাদবাকী সব ফলাফল আশানুরূপ পাওয়া যায়। তাই তখন সিদ্ধান্ত হয় যে এই শিক্ষা সারাদেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে হবে। কারণ এটি একটি জাতীয় সমস্যা এবং ৫ বছরের নীচের শিশুরাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এর শিকার। শিশুদের এই ভয়াবহ রোগের হাত থেকে বাঁচানো যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থার নৈতিক দায়িত্ব। তাছাড়া একটি বিশেষ এলাকায় এ কার্যক্রম চালিয়ে দেশব্যাপী এ সমস্যার কোন ফলপ্রসূ সমাধান সম্ভব নয়। তবে এই মুহূর্তে একসাথে সারাদেশে এই শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর মত সাংগঠনিক শক্তি ব্র্যাকের নেই। তাই ধাপে ধাপে সারাদেশে এই শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং অনুমান করা হয় যে, তা করতে ব্র্যাকের সময় লাগবে প্রায় দশ বছর। অর্থাৎ ১৯৯০ সালের মধ্যে এই শিক্ষার বার্তা বাংলাদেশের প্রতিটি বাড়ীতে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে।

ওটেপের প্রথম ধাপ (জুলাই ১৯৮০ -- সেপ্টেম্বর ১৯৮৩)

ক) কর্মসূচীর উন্নয়ন

প্রথম ধাপ শুরু হয় ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে। শেষ হয় ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। প্রথম ধাপে শেখানো হয় বাংলাদেশের ৫টি বৃহত্তর জেলায়। জেলাগুলো হল-- সিলেট, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা এবং কুষ্টিয়া (সংযোজনী-১)। যেহেতু এটি একটি শিক্ষা সম্প্রসারনের কাজ। তাই তখন ওরাল থেরাপী প্রোগ্রাম নাম পাল্টে রাখা হয় ওরাল থেরাপী এক্সটেনশন প্রোগ্রাম (ও.টি.ই.পি) বা ওটেপ। এই প্রথম ধাপে কর্মসূচীটি বর্ধিত কলেবরে আত্মপ্রকাশ করে। এবং এই কর্মসূচীর উন্নয়নের পেছনে যাদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তারা হচ্ছেন--এই কর্মসূচীর মহিলা ও পুরুষ কর্মীগণ, মনিটরিং ও তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্বে যারা ছিলেন তারা এবং গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ।

কিভাবে সেদিনের সেই ছোট্ট কার্যক্রমটি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রেরণার মাধ্যমে এত বৃহৎ পরিসরে আত্মপ্রকাশ করল তা একে একে বর্ণনা করা হল।

পুরুষ সভা : একবার গবেষণা বিভাগের মোশতাক ভাই গেলেন বানিয়াচং-এ ওটেপের কাজ দেখতে। এসে বললেন যে গ্রামের লোকজন এখনও আমাদের মেয়েদের পরিবার পরিকল্পনার কর্মী হিসেবে গণ্য করে এবং পুরুষদের এই ডায়রিয়ার উপর কোন ধারণাই নেই। অপরপক্ষে, মহিলা কর্মীরা অভিযোগ করল যে মায়েরা স্যালাইন বানানোর সময় কর্মীদের গুড় হাতে নিতে চায়না। কারণ মায়েদের ধারণা ঐ গুড়ের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার ঔষধ আছে। গুড়ের মাধ্যমে হাত দিয়ে তাদের শরীরে পরিবার পরিকল্পনার ঔষধ ঢুকে যাবে এবং বাচ্চা হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এবং এটা হলে তাদের স্বামীরা রাগ করবে এবং তাদের অনেককে হয়তবা তালাক দিয়ে দিবে। তাই গুড় হাতে নিতে তাদের আপত্তি। আবার মনিটরিং রিপোর্টে দেখা গেল যে ডায়রিয়ার উপর যে ধারণা দেয়া হয়েছে তা মহিলারা বুঝতে পেরেছে ঠিকই কিন্তু লবণ-গুড়ের স্যালাইন তারা ততটা ব্যবহার করে না। কারণ হিসেবে দেখা গেল যে আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেয় পুরুষরা। ফলে পরিবারে কারো ডায়রিয়া হলে চিকিৎসা পদ্ধতি কি হবে তাও নির্ভর করে পুরুষদের সিদ্ধান্তের উপর। সবকিছু মিলিয়ে মাসিক সভায় কর্মীরা তখন সিদ্ধান্ত নেয় যে, শুধুমাত্র মায়েদের শিক্ষা দিলে চলবে না। পাশাপাশি পুরুষদেরও এই শিক্ষা দিতে হবে। তাহলে উপরে উল্লেখিত সমস্যাগুলো হয়তোবা দূর করা সম্ভব হবে। তখন থেকে শুরু হয় পুরুষ সভা এবং পুরুষদের শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব বর্তায় পুরুষ কর্মীদের উপর। তবে লবণ-গুড় স্যালাইনের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য পুরুষদের সাথে যোগাযোগ করার উপর আরো জোর দেয়া হয় ১৯৮২ সালের মে মাস থেকে।

ইউনিয়নে অবস্থান দীর্ঘায়িত করা

শুরুতে একটি টিমে ২০ জন মহিলাকর্মী কাজ করত। তারপর মহিলাকর্মীর সংখ্যা কমিয়ে ১৫-১৬ জনে আনা হয়। আরো পরে একটি টিমে ১০-১২ জন মহিলা ও ২ জন পুরুষ কর্মী কাজ করত। একটি ইউনিয়নে সব পরিবারে শেখানো শেষ হলে কর্মীরা পরবর্তী ইউনিয়নে যেত। একটি ইউনিয়নের কাজ শেষ করতে একটি টিমের প্রায় ১৫-২০ দিন লেগে যেত। তারপর তারা আবার নুতন আরেকটি ইউনিয়নে যেত। কিন্তু দেখা গেল যে শেখানোর ফলে যে ধরনের সচেতনতা

ডায়রিয়ার উপর হওয়া উচিত তা হয়না এবং জনগণ লবণ-গুড়ের স্যালাইন ব্যবহারও ততটা করে না। তখন আমাদের কর্মীদের কাছে এর কারণ হিসেবে মনে হয়েছে যে জনগণ আমাদের উপর বিশ্বাস স্থাপনের পূর্বেই আমরা আরেকটা নতুন জায়গায় চলে যাচ্ছি। জনগণ যদি আমাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে না পারে তাহলে আমরা যা শেখাচ্ছি তার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে না। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কর্মীদের যাত্রার দলের লোক বলে গণ্য করা হতো। কারণ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার সময় হাঁড়ি-পাতিল, বাসন-কোসন, বাক্স-পেটরা ও সাথে পুরুষ এবং মহিলা থাকত। তাই লোকজন প্রথমেই আমাদের কর্মীদের যাত্রাদলের লোক বলে ধরে নিত। সুন্দরী মহিলা কর্মীরা জনগণের কাছে নায়িকা হিসেবে আলোচিত হত। এবং আমাদের দেশে যাত্রাদলের লোকজনের সামাজিক মর্যাদা জনগণের নিকট ততটা গ্রহণযোগ্য নয়। এক স্থানে অল্প দিন অবস্থান করার লোকের এই ভুল ধারনা নিরসন করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া যেতো না। অপরপক্ষে কর্মীর গ্রহণযোগ্যতা না থাকলে তার দেওয়া বার্তাও জনগণ গ্রহণ করবে না। আর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য দরকার বিশ্বাস স্থাপন। এইসব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য ইউনিয়নে কর্মীদের অবস্থান দীর্ঘায়িত করতে হবে এবং স্থানীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। অর্থাৎ সমাজের নিয়ম-কানুন মেনে আমাদের কর্মীদের গ্রামে চলাফেরা, উঠা বসা ইত্যাদি করা উচিত। যাতে আমাদের কর্মী সম্পর্কে জনগণের ভ্রান্ত ধারণা পাল্টে যায়। এবং তাদের শেখানো বার্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং লবণ-গুড়ের স্যালাইনের ব্যবহার যেন বাড়ে।

এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮১ সালের মার্চ মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত হবিগঞ্জ উপজেলার লস্করপুর ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে টিমের সদস্য সংখ্যা কমিয়ে ৫-৬ জন মহিলা ও ২ জন পুরুষ কর্মীতে আনা হয় যাতে ঐ ইউনিয়নের সকল মায়েদের শেখাতে ১ থেকে $১\frac{১}{২}$ মাস সময় লাগে। লস্করপুরে এ পরীক্ষানিরীক্ষার দায়িত্বে ছিলেন ফজলুল করিম। তিনি ঐ সময় ঐ টিমের টিম কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব পালন করেন। ঐ সময় ঐখানে বিভিন্ন ফোরামের মাধ্যমে কিভাবে পুরুষদের সাথে যোগাযোগ বাড়ানো যায় তাও পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়। এসাথে কর্মীদের জন্য কতগুলো নর্মস তৈরী করা হয়। যেমন ছাতি মাথায় দিয়ে এবং শাড়ি পরে গ্রামে চলাফেরা করা, পাতলা কাপড় পরে গ্রামে না যাওয়া ইত্যাদি (সংযোজনী-৩)। এসব কিছুই করা হত স্থানীয় কৃষ্টির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও জনগণের ভ্রান্ত ধারণা পাল্টে কর্মীদের উপর বিশ্বাস অর্জনের জন্য। লস্করপুর ইউনিয়নে কাজ শেষ হওয়ার পর গবেষণা বিভাগকে দায়িত্ব দেয়া হয় মূল্যায়নের। দুটি ইউনিয়নে মূল্যায়নের পর দেখা যায় যে লস্করপুর ইউনিয়নের কাজের ফলাফল অন্য ইউনিয়ন অপেক্ষা অনেক ভাল। এই ইউনিয়নের লোকজন ডায়রিয়া বিষয়ে অনেক বেশী সচেতন, ব্র্যাক বললে এককথায় সবাই চেনে, ব্র্যাকের কর্মীদের কেউই পরিবার পরিকল্পনার কর্মী মনে করেনা, লবণ-গুড় স্যালাইনের ব্যবহারও বেশী। গবেষণা বিভাগ রায় দেয় যে, সচেতনতা বৃদ্ধি ও ব্যবহার বাড়ানোর জন্য একই স্থানে অবস্থান একটু দীর্ঘায়িত করা উচিত। আর একই জায়গায় বেশী সময় ধরে থাকতে হলে টিমের সদস্য সংখ্যা কমাতে হবে। এরপর থেকে ওটেপে ৭ জন মহিলা কর্মী ও ২ জন পুরুষ কর্মী নিয়ে টিম গঠিত হয়। এবং একটি ইউনিয়নে একটি টিম প্রায় দেড়মাস অবস্থান করত ও জনগণকে শিক্ষা দিত।

বানানোর পদ্ধতি সহজীকরণ

পরীক্ষামূলক প্রকল্পে যে সমস্যাটি সমাধান করা যায়নি সে সমস্যাটি বার বার করে মনিটরিং-এ ধরা পড়তে লাগল। সমস্যাটি হল গুড় ও লবণের পরিমাণ বা দুই ও একের সমস্যা। এ ব্যাপারে মহিলা কর্মীরা তৎপর বেশী ছিল। কারণ মায়েদের এই গণ্ডগোলের জন্য মহিলা কর্মীদের শেখানোর গ্রেডের মান কম হত এবং তারা বেতন কম পেত। তাই এ ব্যাপারে মহিলা কর্মীদের বক্তব্য ছিল যে গুড়ের পরিমাণ একমুঠি করা যায় কিনা! কারণ তাহলে লবণ এবং গুড়ের পরিমাণের ভিতর কোন গণ্ডগোল বাধবেনা। কিন্তু তখন যে প্রশ্ন দেখা দেয় তাহল স্যালাইনে যে পরিমাণে গ্লুকোজ থাকার কথা এক মুঠি গুড় দিলে তা ঠিক থাকবে কিনা! মহিলা কর্মীদের মতামতের উপর ভিত্তি করে আমি এ ব্যাপারে আবেদ ভাইয়ের সাথে আলাপ করি। উনি উপদেশ দেন পরিবর্তন করার আগে এক মুঠি গুড় দিয়ে স্যালাইন বানিয়ে পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখা উচিত, গ্লুকোজের পরিমাণ ঠিক থাকে কিনা। উপদেশ মত একমুঠি গুড় দিয়ে বেশ কতকগুলো স্যালাইন বানিয়ে তা আইসিডিডিআরবি-এর পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হয় এবং দেখা যায় গ্লুকোজ যে পরিমাণে থাকার কথা ঠিক সেই পরিমাণেই আছে। ফলে চার আঙ্গুলের প্রথম ভাঁজের সমান দুই মুঠি গুড়ের পরিবর্তে হল এক মুঠি গুড়। এতে করে মায়েদের মনে রাখা সহজ হল এবং স্যালাইন বানাতে ভুল হবার সম্ভাবনা কমে গেল। এ পরিবর্তনে সবচাইতে খুশী হয়েছিল মহিলা কর্মীরা। কারণ এতে তাদের শেখানোর কাজ কিছুটা সহজ হয়। ফলে তাদের শেখানোর গ্রেডের মান বাড়ে এবং বেতন বেশী পায়।

ডাক্তার সভা

এতকিছু করার পরেও গবেষণা বিভাগের এবং মনিটরিং-এর রিপোর্টে দেখা গেল ডায়রিয়ার উপর সচেতনতা বৃদ্ধি এবং লবণ-গুড় স্যালাইনের ব্যবহার আশানুরূপ বাড়েনি। তখন কর্মীরা চিন্তা করে যে ডায়রিয়া রোগ হলে সাধারণতঃ গ্রামের লোকজন হাতুড়ে ডাক্তারদের কাছে যায়। হাতুড়ে ডাক্তাররা যদি রোগীদের লবণ-গুড় স্যালাইন খাওয়ার পরামর্শ দেয় তাহলে হয়তোবা লোকজন তা ব্যবহার করতে পারে। যদি ব্যবহার করতে নাও বলে কিন্তু লবণ-গুড় স্যালাইনের বিরুদ্ধে না বলে তবুও হয়তবা স্যালাইনের ব্যবহার বাড়তে পারে। ফলে শুরু হল ডাক্তারদের নিয়ে ফোরাম, যেখানে ডায়রিয়া ব্যবস্থাপনায় লবণ-গুড় স্যালাইনের ভূমিকা তুলে ধরা হত (সংযোজনী-৪)। এই সাথে ডাক্তারদের অনুরোধ করা হত তারা যেন ডায়রিয়া রোগী পেলে লবণ-গুড়ের স্যালাইন খাওয়ার পরামর্শ দেয়। এই নতুন দায়িত্বও পড়ল পুরুষ কর্মীদের উপর। একটি ইউনিয়নের সকল হাতুড়ে ডাক্তারদের নিয়ে সভা করা হত। ঐ সভাতে উপস্থিত থাকার জন্য কিছুসংখ্যক স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকেও বলা হত। সকলের উপস্থিতিতে প্রথমে পুরুষ কর্মীরা ও পরে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডায়রিয়া ব্যবস্থাপনায় লবণ-গুড় স্যালাইনের ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য রাখতেন এবং হাতুড়ে ডাক্তারদের সমর্থন আদায় করতেন। গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াত দেয়ার পিছনে যুক্তি ছিল যে হাতুড়ে ডাক্তাররা যদি তাদের সামনে লবণ-গুড় স্যালাইনকে সমর্থন দেয় তাহলে পরবর্তীতে তারা আর এই স্যালাইনের বিরোধিতা করতে পারবে না।

স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ

এর মধ্যে একবার রিসার্চের মোশতাক ভাই আবার কর্মসূচী দেখার জন্য বাহুবল উপজেলাতে গেলেন। ঘুরে এসে বললেন যে উপজেলা পর্যায়ে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের ডাক্তাররা আমাদের কর্মসূচী সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তখন কর্মীরা ঠিক করল যে, উপজেলাতে যাওয়ার পূর্বেই উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের আমাদের কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত করে তাদের সাহায্য সহযোগিতা কামনা করা উচিত। এছাড়া আরো সিদ্ধান্ত হয় যে হাতুড়ে ডাক্তারদের সভাতে যদি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বা অন্য ডাক্তাররা যান এবং তারা যদি হাতুড়ে ডাক্তারদের লবণ-গুড়ের স্যালাইনের পক্ষে কাজ করার কথা বলেন তাহলে হয়তবা ব্যবহার আরো বাড়তে পারে। সরকারী কর্মকর্তাদের কোন কাজে জড়িত করার জন্য দরকার তাদের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সম্মতিসূচক পত্র। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের পত্র না থাকলে তাদের দিয়ে কাজ করানো খুব মুশকিল। তাই উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়ার জন্য সিভিল সার্জনের অফিস থেকে তাদের কাছে চিঠি ইস্যু করা হত। এরপর থেকে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগের জন্য উর্ধতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে চিঠি ইস্যু করানো ওটিপের একটি কর্মকৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বিশেষ করে স্বাস্থ্য, পুলিশ ও প্রশাসনিক বিভাগে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য চিঠি ইস্যু করানো হত। সেই চিঠির কপি দিয়ে বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের কাছে সহযোগিতা পাওয়ার জন্য আবেদন করা হত। যেমন স্বাস্থ্যবিভাগে সচিবের চিঠি দেয়া হত মহাপরিচালকের কাছে। মহাপরিচালকের চিঠির কপি দেয়া হত সিভিল সার্জনের কাছে। সিভিল সার্জনের চিঠির কপি দেয়া হত থানা হেলথ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর কাছে। একই ভাবে সচিবের চিঠির কপি দেয়া হত জেলা প্রশাসকের কাছে। জেলা প্রশাসকের চিঠির কপি দেয়া হত সার্কেল অফিসারের কাছে এবং সার্কেল অফিসারের চিঠি দেয়া হত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের। একইভাবে পুলিশ বিভাগের থানা পর্যায়ের কর্মকর্তা পর্যন্ত চিঠি দেয়া হত। পুলিশ বিভাগকে চিঠি দেয়ার পিছনে যে যুক্তি ছিল তাহল মহিলা কর্মীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা। কারণ মহিলা কর্মীদের টিম কখনও কখনও গোডাউন, ইউনিয়ন পরিষদের অফিস ও স্কুল ঘরে থাকত এবং এ সকল স্থানগুলো সাধারণত : গ্রামের বাইরে নির্জন স্থানে হয়। চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি থেকে নিরাপত্তা বিধানের জন্য পুলিশ বিভাগের সহযোগিতা চাওয়া হত। এ কর্মকৌশল অবশ্য সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। আর এসব কাজ করার দায়িত্ব পড়ল পুরুষ কর্মীদের উপর।

স্কুল ফোরাম

এরপর চিন্তাভাবনা শুরু হয় কিভাবে লবণ-গুড়ের স্যালাইনকে জনপ্রিয় করে এর ব্যবহার বাড়ানো যায়। ব্যাপক প্রচার ও জনপ্রিয় করার জন্য কাদের ক্যাডার হিসেবে গড়ে তোলা যায়। এসব ভাবনা থেকে আসে স্কুল ফোরাম। কারণ ক্যাডার হিসেবে ছাত্রদেরকে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া আগামীতে এরাই ডায়রিয়া ব্যবস্থাপনার জন্য লবণ-গুড়ের স্যালাইন ব্যবহার করবে এবং ভবিষ্যতে ডায়রিয়া চিকিৎসায় লবণ-গুড়ের স্যালাইন আমাদের সংস্কৃতির একটা অংশ হিসেবে গণ্য

হবে। অপরপক্ষে শিক্ষকরা সমাজে শ্রদ্ধার পাত্র। কেউ কোন বিপদে পড়লে গ্রামে বুদ্ধি পরামর্শ নেয়ার জন্য শিক্ষকদের কাছে যায়। তাই শিক্ষক সম্প্রদায় যদি জনগণকে লবণ-গুড়ের স্যালাইন খাওয়ানোর কথা বলে তাহলে হয়ত জনগণ তা ব্যবহার করতে উৎসাহিত বোধ করবে। স্কুল ফোরামে কাজ হবে ছাত্রদের ডায়রিয়ার উপর শিক্ষা দেয়া এবং স্যালাইনকে জনপ্রিয় করার জন্য প্রতি ছাত্রকে ১০টি করে পরিবারের দায়িত্ব দেয়া। অপরপক্ষে, শিক্ষকদেরকে বুঝিয়ে অনুরোধ করা যাতে কেউ পরামর্শ চাইলে যেন লবণ-গুড়ের স্যালাইন ব্যবহারের কথা বলে এবং স্যালাইনকে জনপ্রিয় করার জন্য ছাত্ররা কি করছে তার খোঁজ খবর রাখে। এখানে ছাত্রদের কাজ সম্পর্কে একটু ধারণা দিতে চাই। ছাত্রদের কাজ ছিল দায়িত্বপ্রাপ্ত ১০টি পরিবারে প্রতিদিন খোঁজ খবর নেয়া এবং ডায়রিয়া রোগী পেলে সেই পরিবারকে লবণ-গুড়ের স্যালাইন দিয়ে রোগী চিকিৎসার পরামর্শ দেয়া। এসব ক্যাডারদের ব্র্যাকের মনোগ্রাম সহ "ডায়রিয়া প্রতিরোধ করুন" সম্বলিত ব্যাজ দেয়া হত। তারা যে সব রোগী পেত এবং লবণ-গুড় স্যালাইন খাওয়ানোর পরামর্শ দিত তা তারা স্কুলের শিক্ষকদের কাছে রিপোর্ট করত। দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক এ সব রোগীদের রেকর্ড রাখত। পরবর্তীতে ক্যাডারদের কাজের উৎসাহ বাড়ানোর জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে স্কুলগুলোর ডায়রিয়া রোগী চিকিৎসা ও এলাকার জনগণের ডায়রিয়া সম্পর্কে ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার ছিল যথাক্রমে ১০০০, ৫০০ ও ৩০০ টাকা। কিন্তু পরবর্তীতে মূল্যায়নে দেখা গেল এই পুরস্কার পাওয়ার জন্য শিক্ষক ও ছাত্ররা উভয়েই মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং কাগজে কলমে বেশী রোগী দেখায়। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকলে আগামী প্রজন্মের নৈতিক অধঃপতন ঘটতে পারে এই আশংকায় স্কুলে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা পরবর্তীতে বন্ধ করে দেয়া হয়। এই স্কুল ফোরাম পরিচালনা করার দায়িত্বও দেয়া হয় পুরুষ কর্মীদের উপর। তবে মাঝে মাঝে সাহায্য করার জন্য মহিলা কর্মীরাও পুরুষ কর্মীদের সাথে স্কুলে যেত।

শিক্ষক ওয়ার্কশপ

শিক্ষক সম্প্রদায় সমাজে শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের কথা ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা সবাই শোনে। তাই শিক্ষক সম্প্রদায় যাতে এ কর্মসূচীতে সমর্থন যোগায় তার জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালানো হয়। স্কুল ফোরামের মাধ্যমে অবশ্য প্রতিটা স্কুলে যেয়ে শিক্ষকদেরকে লবণ-গুড় স্যালাইন সম্পর্কে বুঝানো হত এবং সমর্থন আদায় করা হত। কিন্তু এ ছাড়াও শিক্ষকদের সমর্থন আদায়ের জন্য থানা পর্যায়ে শিক্ষকদের এক ওয়ার্কশপ করা হত যেখানে লবণ-গুড় স্যালাইনের ব্যবহারের পক্ষে শিক্ষকরা যাতে কাজ করে তার জন্য অনুরোধ করা হত। এ ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে ব্র্যাকের খুব বেশী ঝামেলা পোহাতে হত না। কারণ ঐ সময় থানা পর্যায়ে শিক্ষকদের নিয়ে মাসে থানা শিক্ষা কর্মকর্তা এক সভা করতেন। ব্র্যাকের পুরুষ কর্মীরা থানা শিক্ষা কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে ঐ মাসিক শিক্ষক সভাতে যেত এবং লবণ-গুড় স্যালাইনের পক্ষে বক্তব্য রাখত। থানা শিক্ষা কর্মকর্তাও অবশ্য শিক্ষকদেরকে অনুরোধ করতেন যাতে তাদের কাছে কেহ ডায়রিয়া রোগীর ব্যাপারে এলে যেন লবণ-গুড় স্যালাইন খাওয়ার পরামর্শ দেয়।

ইউনিয়ন পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সভা

ইউনিয়ন পর্যায়ে এই সভাটি করার উদ্দেশ্য ছিল ইউনিয়নে ব্যাপক প্রচারের জন্য। একটি ইউনিয়নে সকল স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের লবণ-গুড় স্যালাইনের উপর শিক্ষাদান শেষ হলে সকল স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে এই কেন্দ্রীয় সভা করা হত। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্ররা ইউনিয়নের একটি মধ্যবর্তী জায়গায় একত্রিত হত। ছাত্ররা স্কুল থেকে "ডায়রিয়া প্রতিরোধ করুন" ব্যানার ও "ডায়রিয়া প্রতিরোধ করুন" ব্যাজসহ এবং "ডায়রিয়া প্রতিরোধ করুন" স্লোগান সহকারে গ্রামের রাস্তা দিয়ে সভাস্থানে হাজির হত। সভাস্থলে ছাত্রদের এই সভা দেখার জন্য আশেপাশের গ্রামের লোকজন হাজির হত। সভাতে শিক্ষকরা লবণ-গুড় স্যালাইন বানানো ও খাওয়ানোর নিয়ম সম্পর্কে বক্তব্য রাখত। এবং কারো ডায়রিয়া হলে লবণ-গুড় স্যালাইন খাওয়ার পরামর্শ দিত। এতে করে ইউনিয়নের সকল গ্রামে খুব দ্রুত লবণ-গুড় স্যালাইনের প্রচার করা যেত।

গণকেন্দ্র

স্কুলকে কেন্দ্র করে গণকেন্দ্র লাইব্রেরী গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে আরো উন্নয়নের বিভিন্ন বার্তা জনগণের কাছে পৌছানো যায় এবং গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় পাশ করা ব্যক্তিদের পড়ার দক্ষতা বাড়ানো যায় বা ধরে রাখা যায়। কাজ ছিল প্রতিটি স্কুল বা ক্লাবে একটি ছোট পাঠাগার গড়ে তোলা। যেখানে উন্নয়নমূলকসহ বিভিন্ন বিষয়ের বই থাকবে। উৎসাহী জনগণ বিকালে বা সন্ধ্যায় ঐসব পাঠাগারে আসবে, বই পড়বে এবং প্রয়োজনে ধার করে বাড়ীতে নিয়ে যাবে ও পড়বে। এই বই পড়ার মাধ্যমে অনেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ধ্যান ধারণা পাবে ও তা বাস্তবায়িত করবে। যে প্রক্রিয়ায় পাঠাগার গড়ে তোলা হত তা হচ্ছে স্কুলের ছাত্র বা ক্লাবের সদস্যদেরকে বলা হত ব্র্যাকের মুখপত্র মাসিক গণকেন্দ্র পত্রিকার ১০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ করতে। তখন গণকেন্দ্র পত্রিকার বাৎসরিক চাঁদা ছিল ১৮ টাকা। ১৮০০ টাকা কোন স্কুল বা ক্লাব সংগৃহীত চাঁদা হিসেবে ব্র্যাকের কাছে জমা দিলে ব্র্যাক ঐ স্কুল বা ক্লাবকে বইয়ের ক্যাটালগ পাঠাত। ক্লাব বা স্কুল সেখান থেকে ২৪০০ টাকার বইয়ের পছন্দ তালিকা পাঠাত। তাদের পাঠানো তালিকা অনুযায়ী ব্র্যাক ২৪০০ টাকার বই ঐ স্কুল বা ক্লাবকে পাঠাত। আর যারা গণকেন্দ্র পত্রিকার গ্রাহক হত ব্র্যাক সরাসরি তাদের নামে এক বছর গণকেন্দ্র পত্রিকা পাঠাত। এই পাঠাগার তৈরীর দায়িত্বে ছিল পুরুষ কর্মীরা।

মসজিদ ফোরাম

তারপর দেখা গেল সমাজে জনমত গঠনের ব্যাপারে ইমাম বা মৌলভী সাহেবদের ভূমিকা কোন অংশেই কম নয়। তাছাড়া গ্রামে মহিলা কর্মীদের চলাফেরার ব্যাপারে ধর্মীয় গোঁড়ামী কিছুটা বাধা হিসেবে কাজ করত। তাই ইমাম বা মৌলভী সাহেবরা যাতে এই কর্মসূচীর বিপক্ষে কোন কথা না বলে তার জন্য শুরু হয় মসজিদ ফোরাম এবং এই ফোরাম পরিচালনার দায়িত্বও পড়ল পুরুষ কর্মীদের উপর। শুক্রবারের দিন জুম্মার নামাজের পর ইমাম সাহেবরা ব্র্যাক এবং লবণ-গুড় স্যালাইন সম্পর্কে নামাজীদের বলত। ইমাম সাহেবদের এই বক্তব্য রাখার জন্য আগে থেকেই আমাদের কর্মীরা ইমাম সাহেবদের সাথে যোগাযোগ করত এবং লবণ-গুড় স্যালাইন সম্পর্কে কি বলতে হবে তা বুঝাত। যে শুক্রবারে যে মসজিদে ইমাম সাহেব বক্তব্য রাখতেন আমাদের কর্মীরাও ঐ মসজিদে সেদিন নামাজ আদায় করত।

উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে পূর্ব যোগাযোগ

প্রথমদিকে উপজেলা পর্যায়ে শুধুমাত্র স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের ওটেপের তৎপরতার সাথে জড়িত করা হত। কিন্তু দেখা গেল উপজেলা পর্যায়ে সরকারের আরো বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারী আছে। এবং তাদের কাজও গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। যেমন কৃষি বিভাগ, সমবায় সমিতি, পশুপালন বিভাগ ইত্যাদি যারা তাদের কাজের সাথে লবণ-গুড়ের স্যালাইনের প্রচার করতে পারে। এ ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা গ্রামে খুবই প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য তাদের সমর্থন খুবই প্রয়োজনীয়। তাই পরবর্তীতে শুরু করা হয় উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে পূর্ব যোগাযোগ। অর্থাৎ কোনো উপজেলাতে কাজ শুরু করার কমপক্ষে ১ মাস পূর্বে পুরুষ কর্মীরা ঐ উপজেলাতে ওটেপের কিছু পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদি সাথে করে নিয়ে যেত এবং তারা উপজেলা পর্যায়ে সকল কর্মকর্তাদের সাথে সভা বা কখনও কখনও ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে ওটেপ কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত করত। সাথে সাথে ঐ উপজেলাতে ওটেপের সম্ভাব্য বাস্তবায়নের পরিকল্পনা জানিয়ে দিত ও তাদের সমর্থন আদায় করত। এরপরে উপজেলা পর্যায়ে কিছু পোস্টার (সংযোজনী-১৩) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় লাগাত এবং লিফলেট বিতরন করত। উপজেলা পর্যায়ের কাজ শেষ করে তারা ঐ উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে যেত এবং একইভাবে সভা বা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ কর্মীর সমর্থন আদায় করত। তারপর ইউনিয়ন পর্যায়েও কিছু পোস্টার ও লিফলেট (সংযোজনী-৬) বিতরন করত। ঐ সময়ে তারা এসব ইউনিয়নে তাদের সম্ভাব্য থাকার জায়গাও ঠিক করে আসত। এছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি যেমন, পরিবারের সংখ্যা, স্কুলের সংখ্যা, মসজিদের সংখ্যা, হাতুড়ে ডাক্তারের সংখ্যা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিয়ে আসত। এতে করে দেখা গেল ঐ উপজেলার ইউনিয়নগুলোতে কাজ করার জন্য কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করা সুবিধা হত এবং ব্র্যাক বললেই সহজে ঐসব এলাকার জনগণ বুঝতে পারত। ফলে, পূর্বে জনগণের দিক থেকে যে অসুবিধা ছিল যেমন যাত্রার দল বা পরিবার পরিকল্পনার কর্মী হিসেবে চিন্তা করা তা কিছুটা দূরীভূত হল।

শিক্ষার পদ্ধতি হিসেবে দ্বিমুখী যোগাযোগ

ওটেপের প্রথম দিকে একবার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রিচার্ড ক্যাশ মহিলা কর্মী কর্তৃক মায়েদের শেখানোর কাজ দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এখানে বলে রাখা ভাল যে ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কর্মসূচীর সাথে রিচার্ড ক্যাশ প্রথম থেকেই জড়িত ছিলেন। মহিলা কর্মীদের কাজ দেখে তিনি মত প্রকাশ করলেন যে কর্মীরা প্রায় টেপ রেকর্ডারের মত কাজ করে। অর্থাৎ মায়েদের কাছে গিয়ে একতরফাভাবে তারা ১০ পয়েন্ট বর্ণনা করে এবং সকল মায়ের বেলায় একইভাবে উপস্থাপন করে থাকে। এতে করে অনেক ক্ষেত্রে অনেক মা অমনোযোগী হতে পারে এবং শিক্ষা ততটা ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। রিচার্ড ক্যাশের এই মতামত পাওয়ার পর চিন্তাভাবনা শুরু হয় কিভাবে যোগাযোগটাকে দ্বিমুখী করা যায়। এই চিন্তার ফলশ্রুতিতে আসে ফ্লিপচার্ট এবং পরবর্তীতে মহিলা কর্মীরা এই ফ্লিপচার্ট দেখিয়ে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে মায়েদের শিক্ষাদান করত।

রোগী খোঁজা ও তার যত্ন

এত সব কর্মকান্ড পরিচালনার পরও দেখা গেল লবণ-গুড় স্যালাইনের ব্যবহার ব্র্যাকের আশানুরূপ নয়। ব্র্যাকের ধারণা ছিল কমপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগ লোক ডায়রিয়া হলে এই স্যালাইন-ব্যবহার করবে। কিন্তু জরীপে দেখা গেল শতকরা ৯০ জন মা স্যালাইন সঠিকভাবে বানাতে পারে এবং তা ব্যবহার খুবই নিরাপদ ও কার্যকরী। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে স্যালাইন ততটা ব্যবহৃত হয় না। ব্যবহারের হার মাত্র শতকরা ৪০। কর্মীরা তখন ভীষণ চিন্তায় পড়ল। কারণ শিশু মৃত্যুর হার কমাতে হলে শুধুমাত্র জনগণের ডায়রিয়া বিষয়ে ধারণা থাকলে চলবে না। প্রয়োজন তার ব্যবহার নিশ্চিত করা। তখন অনুসন্ধান চলল জনগণ কেন ব্যবহার করে না তার উপর। অনুসন্ধানে দেখা গেল বেশ কতগুলো কারণ এর পিছনে কাজ করছে। কারণগুলো হল ঃ

ক) এত সহজলভ্য দ্রব্যাদি দিয়ে তৈরী ঔষধে কি ডায়রিয়ার মত এত জটিল রোগ সারে !

খ) যেহেতু গুড় বেশী পরিমাণে খেলে এমনিতেই পাতলা পায়খানা হয়, তাহলে সেই গুড় আবার কিভাবে পাতলা পায়খানা নিরাময়ের কাজে সাহায্য করতে পারে !

গ) যেহেতু লবণ-গুড়ের স্যালাইন জনগণের কাছে নতুন এবং ডায়রিয়া বেশী হয় বাচ্চাদের। তাই, তারা বাচ্চাদের জন্য নতুন কোন জিনিষ ব্যবহার করে ঝুঁকি নিতে চায় না।

কর্মীদের এইসব পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে যদি জনগণকে এই লবণ-গুড় স্যালাইনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাতে হয় তাহলে গ্রামে রোগী খুঁজে বের করতে হবে এবং রোগীকে লবণ-গুড়ের স্যালাইন ব্যবহারের মাধ্যমে সারিয়ে তুলতে হবে। এটা করতে পারলে জনগণ তখন এই স্যালাইনের উপর আস্থা স্থাপন করবে এবং প্রয়োজনে ব্যবহার করবে। আরো সিদ্ধান্ত হয় যে রোগী ভাল হওয়ার পর ঐ পাড়ায় বা গ্রামে সভা ডেকে রোগীকে দিয়ে ঐ সভায় লবণ-গুড়ের স্যালাইনের উপকারিতা সম্পর্কে বলানোর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে জনগণ এই স্যালাইনে আস্থা আনতে পারে।

এরপর থেকে শুরু হয় গ্রামে রোগী খোঁজা ও তার যত্ন। রোগী ভাল হলে আয়োজন করা হত দৃষ্টান্তমূলক সভা। রোগী খোঁজার দায়িত্ব পড়ল মহিলা কর্মীদের উপর। তারা যখন মায়েদের শেখানোর জন্য বাড়ীতে যেত তখন প্রথমেই জিজ্ঞাসা করত ঐ মুহূর্তে বাড়ীতে কোন ডায়রিয়া রোগী আছে কিনা ! রোগী পেলে প্রথমে মহিলা কর্মী স্যালাইন বানিয়ে রোগীকে খাওয়াত। তারপরে সে পুরুষ কর্মীকে ঐ রোগী সম্পর্কে ঐদিনই খবর দিত যাতে করে রোগী সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত পুরুষ কর্মীটি রোগীর যত্ন নিতে পারে। সুস্থ হবার ২/১ দিন পর ঐ গ্রামে পুরুষ কর্মীর দায়িত্ব ছিল সভা আয়োজন করে রোগী কিভাবে সুস্থ হয়ে উঠল তা ঐ সভায় বর্ণনা করা। এতে করে দেখা গেছে জনগণের বিশ্বাস স্থাপনের কাজটি খুবই সহজ হয়েছে। তাই তখন থেকে রোগী খোঁজা ও তার যত্নের উপর বেশী গুরুত্ব দেয়া হত।

মহিলা সেমিনার

গ্রামে মহিলা ক্যাডার তৈরীর উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মহিলা সেমিনারের আয়োজন করা হত। মহিলা কর্মীরা গ্রামে যে সকল মহিলারা একটু চটপটে এবং যারা গ্রামের অন্যান্য পাড়া বা বাড়ীতে ঘোরাফিরা করে তাদেরকে নিয়ে এক সেমিনার করত এবং সেখানে লবন-গুড় স্যালাইনের পুনঃ শিক্ষা দিত। মহিলা কর্মীরা এই সভাতে স্বাস্থ্য শিক্ষা চিত্রমালার চার্ট ব্যবহার করত। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেছে যে এই সব মহিলা ক্যাডাররা গ্রামে লবন গুড় স্যালাইনের উপর খুব একটা বেশী কাজ করে না। তাই পরবর্তীতে মহিলা সেমিনার কর্মসূচী থেকে বাদ পড়ে যায়।

হাট ফোরাম

লবণ-গুড়ের স্যালাইনকে আরো জনপ্রিয় এবং পুরুষদের আরো সচেতন করার জন্য শুরু হয় হাট ফোরাম। অনেক সময় দেখা গেছে গ্রামে পুরুষদের সভা ঠিকমত করা যায়নি। কারণ দিনে অনেককেই বাড়ীতে পাওয়া যায় না। কারণ কাজে কর্মে সাধারনতঃ তারা মাঠে থাকে। কিন্তু গ্রামে হাটের দিন একসাথে অনেক পুরুষকে পাওয়া যায়। এবং মাইকের মাধ্যমে যদি ডায়রিয়ার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো (সংযোজনী ২.২ এর ১, ৪, ৬ ও ৭ নং পয়েন্টগুলো) তুলে ধরা যায় তাহলে অতি সহজেই অনেকগুলো পুরুষকে এ ব্যাপারে সচেতন করা যায় এবং ব্যাপক প্রচার করা যায়। এই হাট ফোরামের দায়িত্বও পড়ল পুরুষ কর্মীদের উপর।

হাট ফোরামের পর হাটের বিশেষ বিশেষ দোকানগুলোতে যেমন চায়ের দোকান, সেলুন, বড় বড় মুদিখানা ইত্যাদিতে পোষ্টার লাগানো হত। অনেক সময় রেস্টুরেন্টে পোষ্টার লাগাতে রেস্টুরেন্টের মালিকরা বাধা দিত। কারণ পোষ্টারে পাতলা পায়খানার ছবি খাওয়ার সময় খরিদ্দাররা পছন্দ করত না।

স্পট সেমিনার

পুরুষদের লবণ-গুড়ের স্যালাইনের উপর অধিকহারে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন ফোরামের আয়োজন করা হয়েছিল। যেমন- পুরুষ সভা, দলীয় সভা, ইমাম মাহফিল, শিক্ষক ওয়ার্কশপ, মসজিদ ফোরাম, ডাক্তার সভা, হাট ফোরাম ইত্যাদি। কিন্তু এত কিছুর করার পরও দেখা গেল বছরের কিছু কিছু সময়ে বিশেষ করে আবাদ মৌসুমে কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের কোন সভাতেই গ্রামে পাওয়া যায় না। ফলে তারা লবণ-গুড় স্যালাইনের শিক্ষাদান কার্যক্রম থেকে বাদ পড়ে যেত। তাই অনেক আলাপ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, মাঠে ঘাটে যাকে যেখানে যে অবস্থায় পাওয়া যায় তাকে সেখানেই লবণ-গুড় স্যালাইনের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলো (যে বিষয়গুলো হাট ফোরামে উল্লেখ করা হয়েছে) শিখাতে হবে। এতে বিশেষ করে রাস্তায় মাঠে ও ফসলের ক্ষেত্রে প্রচুর লোককে শেখানো সম্ভব হয়েছিল।

বলা যায় প্রথম ধাপে কর্মসূচীর যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন হয়। এ ধাপে বিশেষ নজর দেয়া হয় পুরুষদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও কর্মসূচীতে তাদের সমর্থন পাবার জন্য। এরপরে নজর দেয়া হয় কর্মসূচীর ছোটখাট পরিবর্তনের দিকে। যেমন ঃ-

চা বাগানে ডায়রিয়া শিক্ষা কার্যক্রম

সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ এলাকায় অনেক চা বাগান আছে। চা বাগানের শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের সমাজ ব্যবস্থা আমাদের সমাজ ব্যবস্থা থেকে একটু ভিন্নতর। চা বাগানের সমাজ কাঠামো অনেক সংঘবদ্ধ ও সুশৃংখল। যেমন সমাজের উপর স্তরের কোন ব্যক্তি বা নেতা আদেশ বা উপদেশ দিলে নীচের স্তরের সবাই তা এক বাক্যে মেনে নেয় এবং সে অনুসারে কাজ করে। এ বিষয়টি অবশ্য শিক্ষা কার্যক্রমের পক্ষে ছিল। বিপক্ষে যেটি ছিল তাহল চা বাগানের মহিলাদের এই শিক্ষা কার্যক্রমভুক্ত করা। কারণ চা বাগানে দিনে মহিলাদের পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। দিনে তারা চা বাগান হতে চা পাতা তোলার কাজে ব্যস্ত থাকে। তাই এই সুবিধা এবং অসুবিধা আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে চা বাগানের জন্য এই শিক্ষা কার্যক্রমের কৌশলগত পরিবর্তন দরকার। কি ধরনের কৌশলগত পরিবর্তন দরকার তার জন্য ২ সদস্যবিশিষ্ট টিম চা বাগানে পাঠানো হয় পর্যবেক্ষণ করার জন্য। এই টিমের নেতৃত্ব দেন কামরুল ইসলাম (বর্তমানে উনি ব্র্যাকে নেই)। তাদের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত হয় যে চা বাগানে প্রতি খানা থেকে একজন করে মহিলাকে শেখানোর দরকার নেই। যা দরকার তাহল প্রথমে চা বাগানের ম্যানেজারের অনুমতি। তারপর বড় বাবুর অনুমতি সাপেক্ষে টিলা বাবুদের নিয়ে ডায়রিয়ার উপর ওয়ার্কশপ করা ও বার্তাগুলো পৌঁছানো। পরবর্তীতে টিলাবাবুদের দায়িত্ব হবে চা বাগানের সবাইকে বার্তাগুলো শেখানো ও লবণ-গুড় স্যালাইন তৈরী শেখানো। আরো পরে অবশ্য বেশী সংখ্যক লোককে শিখানোর জন্য চা শ্রমিকদের প্রত্যেক লাইন থেক একজন সর্দারকে শিখানো হত এবং সে তার লাইনের অন্যান্য লোকজনকে শিখাত। এখানে উল্লেখ্য যে শিক্ষাদানের দিনে ১ দিনের মজুরী ব্র্যাক প্রদান করত। কারণ সে এই সেমিনারে আসার জন্য ঐ দিনে অন্য কাজ পেত না এবং ঐদিন কোন আয় করতে পারত না।

পাত্রে দাগ কাটা

আমাদের দেশে আধাসের পরিমাণ পানি ধরে এমন পাত্র সব বাড়ীতে পাওয়া যায় না। স্যালাইন বানানোর জন্য কেউ বড় গামলা, কেউ ঘটি, আবার কেউবা ব্যবহার করে বড় টিনের বাটি। কিন্তু স্যালাইন বানানোর জন্য পানির নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পানির পরিমাণ কম-বেশী হলে স্যালাইনে লবণের পরিমাণ কম-বেশী হয়। এতে করে লবণের পরিমাণ কখনও বিপদজনক পর্যায় অতিক্রম করে যেতে পারে। তাই পানির পরিমাণ যাতে সঠিক হয় তার জন্য মহিলা কর্মীরা মায়েদের পাত্রে দাগ কেটে চিহ্ন দিয়ে আসত। এবং বলে আসত স্যালাইন বানাতে আধাসের পানির জন্য যেন ঐ দাগ কাটা পাত্রটি ব্যবহার করে। যেসব বাড়ীতে দুধ বিক্রী করে তাদের বাড়ীতে ১ পোয়ার পাত্র পাওয়া যায়। তাদের বলা হত স্যালাইন বানানোর সময় যেন ঐ পাত্রের ২ পাত্র পানি নেয়।

সাত পয়েন্ট

মনিটরিং রিপোর্টে দেখা গেল কিছু বার্তা মায়েরা মনে রাখতে পারে না। আবার কিছু বার্তা আছে যেগুলোর উপর জোর দিলে তবে মায়েরা স্যালাইন ব্যবহার করতে চায় না। তাই কতিপয় বার্তা বাদ দিয়ে এবং কিছু একত্রিত করে দশ পয়েন্ট থেকে সাত পয়েন্ট করা হয় (সংযোজনী-২.২)।

গ্রামে মহিলা কর্মী কর্তৃক স্যালাইন খাওয়া

লবণ-গুড়ের স্যালাইনের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল স্যালাইনের প্রতি মায়েদের বিশ্বাস স্থাপন। তার জন্য কর্মসূচীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবর্তন আনা হয়েছে। ব্র্যাকের মহিলা কর্মী কর্তৃক বানানো স্যালাইনকে গ্রামের মায়েরা পরিবার পরিকল্পনার ঔষধ বলে গণ্য করত। তাই পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে কর্মীরা স্যালাইন বানানোর পর প্রথমে নিজে খেয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে যাতে গ্রামবাসীরা এটাকে আর পরিবার পরিকল্পনার ঔষধ না ভাবে।

মনিটরিং টিম থেকে রি-ইনফোর্সমেন্ট টিম

প্রথম দিকে মনিটরিং টিমে থাকত ২ জন পুরুষ কর্মী। তাদের কাজ ছিল মহিলা কর্মীদের শেখানোর ১ মাস পর ১০% মায়েদের ১০ পয়েন্টের উপর শেখানো ধারণা জানা ও মায়েরা লবণ-গুড়ের স্যালাইন সঠিকভাবে বানাতে পারে কিনা তা দেখা। এর সাথে মায়েদের বানানো স্যালাইন ছোট ছোট ভায়ালে সংগ্রহ করা। ওটেপ কর্মসূচীর ধরণই ছিল মায়েদের কাছে শুধুমাত্র একবার যাওয়া এবং ২৫-৩৫ মিনিট শিক্ষা দেয়া। এতে করে তখন চিন্তাভাবনা করা হয় যে যদি এই শিক্ষাটা মায়েদের এবং পুরুষদের আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেয়া যায় তাহলে হয়ত মনে রাখার হার বাড়বে এবং এই স্যালাইনের ব্যবহারও বাড়ানো যাবে। তাই ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে মনিটরিং টিমের দায়িত্ব আরো বাড়ানো হয় এবং নামকরণ করা হয় রিইনফোর্সমেন্ট টিম। তখন মনিটরিং-এর সাথে সাথে আরো দুটি দায়িত্ব দেয়া হয়। একটি ব্যবহারের হার দেখা এবং অপরটি হচ্ছে মায়েদের এবং পুরুষদের শিক্ষাটাকে বিভিন্ন সভা ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে ঝালাই করা অর্থাৎ পুনরায় শিক্ষা দেয়া। যেহেতু তাদের কাজ বেড়ে গেল তাই টিমের সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় ৪ জন। ঐ সময়ে মনিটরিং রিপোর্টে দেখা গেছে প্রায় শতকরা ৯০ জন মা কার্যকর ও নিরাপদ স্যালাইন বানাতে পারে এবং শতকরা ৪০ জন ব্যবহার করে।

মনিটরস্ মনিটর

একবার হবিগঞ্জের কাছে কোন একটি মনিটর টিমের কাজ দেখতে আমি ও মুশফিকুর রব চৌধুরী (সে তখন মৌলভীবাজারের এরিয়া ম্যানেজার) বেলা ১১.৩০ টার দিকে টিমে যাই। যেয়ে ঘরে না ঢুকে দরজার কাছে দাঁড়াতেই দেখি ২ জন মনিটর বিছানায় শুয়ে দেয়ালে পা ঠেকিয়ে মনিটরিং এর কাগজটি হাতে নিয়ে তাদের ইচ্ছেমত শীট পূরণ করছে। তাদের মনিটরিং এর কাজ শেষ অর্থাৎ শীট সম্পূর্ণ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমি ও রব সাহেব দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। শেষ হলে আমরা প্রশ্ন করলাম কি মনিটরিং শেষ? তারা আমাদের দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। আমরা সাথে

সাথে তাদেরকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করলাম এবং টিম থেকে চলে যেতে বললাম। তারপর অফিসে এসে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে মনিটরদের কাজের গুণগত মান বজার রাখার জন্য তাদের কাজের ৫% আবার মনিটর করতে হবে। এবং এই মনিটরিং এর দায়িত্ব ছিল মনিটরস্ মনিটর টিমের। মনিটরদের কাজকে অন্যভাবে চেক করার জন্য মহিলা কর্মীদের মায়েদের কনিষ্ঠ সন্তানের নাম লিখে আনতে বলা হত। অপরপক্ষে মনিটরদেরও বলা হত তারা যে মাকে মনিটরিং করবে তার কনিষ্ঠ সন্তানের নাম লিখে আনতে। পরবর্তীতে এই কনিষ্ঠ সন্তানের নাম মিলিয়ে দেখা হত মিলে কিনা। এগুলো করার ফলে পরবর্তীতে মনিটরদের কাজের গুণগতমানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল।

প্রচার

জনগণের সচেতনতা ব্যাপকহারে বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে প্রচারণা চালানো হয়। যেমন ফোল্ডার, পোষ্টার, লিফলেট, ছাত্রদের ব্যাজ ইত্যাদি। এছাড়াও শহর ও গ্রামের শিক্ষিত ও সচেতন জনগোষ্ঠীর সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে রেডিও ও টেলিভিশনে-এর প্রচারণা চালানো হয় (সংযোজনী-৮ থেকে-১২)। এতে করে দু'ধরনের লাভ হয়েছে। একটি হচ্ছে, লবণ-গুড়ের স্যালাইনের জনপ্রিয়তা অর্জন হয়েছে ও বিশ্বাসযোগ্যতা বেড়েছে। কারণ গ্রামের লোকজন রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রচারিত বক্তব্যকে মনে করে সরকারের বক্তব্য এবং সরকারের বক্তব্য জনগণ বিশ্বাস করে ও গুরুত্ব দেয়। অপরটি হচ্ছে, ব্র্যাকের ব্যাপক পরিচিতি। ১৯৮০ সালে "ব্র্যাক" বললে কমপক্ষে আধাঘন্টা লোকজনকে বোঝাতে হত ব্র্যাক কি। কিন্তু কর্মসূচীর প্রথম ধাপের মাঝামাঝি সময়ে ব্র্যাক বললেই লোকজন চিনতে পারত এবং বুঝত যে লবণ-গুড়ের স্যালাইন হল ব্র্যাকের অন্যতম কার্যক্রম।

মাঠ গবেষণাগার

প্রথমদিকে মনিটরিং টিম মায়েদের বানানো স্যালাইন ভায়ালে সংগ্রহ করত। এবং পরবর্তীতে তা আইসিডিডিআর,বি-এর গবেষণাগারে পরীক্ষা করা হত। কিন্তু যখন কার্যক্রম আরো বিস্তৃত হল এবং এরিয়া কার্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন এত বিপুল সংখ্যক নমুনা স্যালাইন আইসিডিডিআর,বি-এর গবেষণাগারে পরীক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। তখন চিন্তাভাবনা করা হয় এরিয়া অফিস পর্যায়ে একটা করে গবেষণাগার স্থাপন করা সম্ভব কিনা এবং যদি সম্ভব হয় তাহলে সেখানে মায়েদের তৈরীকৃত স্যালাইন বিশ্লেষণ করা যাবে। আলোচনায় দেখা গেল মাঠ পর্যায়ে গবেষণাগার স্থাপন করা সম্ভব। কিন্তু সোডিয়াম বিশ্লেষণ না করে বিশ্লেষণ করতে হবে ক্লোরাইডের পরিমাণ। সোডিয়াম বিশ্লেষনের চেয়ে ক্লোরাইড বিশ্লেষন সহজ এবং এজন্য তুলনামূলকভাবে কম উপকরন প্রয়োজন। যেহেতু সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড প্রায় সমান সমান পরিমাণে থাকে তাই সোডিয়ামের পরিবর্তে ক্লোরাইড বিশ্লেষণ করলেই চলবে। এ ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেন আইসিডিডিআর,বি এর ওয়াহেদ ভাই। তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতায় অবশেষে মাঠ পর্যায়ে গবেষণাগার স্থাপন করা হয়। এরপর যে প্রশ্ন বড় আকারে দেখা দিল তাহল, মাঠ পর্যায়ে গবেষণাগারের বিশ্লেষণের গুণগত মান নিয়ে। এবং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় যে, মাঠ পর্যায়ে বিশ্লেষিত স্যালাইনের ১০% আইসিডিডিআর,বি-তে বিশ্লেষণ করা হবে এবং গুণগত মান যাচাই করে মাঠ পর্যায়ের গবেষণাগারের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে (সংযোজনী-১৮)।

এতক্ষণ আমরা দেখলাম একটা ছোট কর্মসূচী যেখানে শুধুমাত্র মহিলা কর্মীরা মায়েদের ডায়রিয়ার উপর শিক্ষা দিত সেই কর্মসূচী কিভাবে ক্রমশঃ তার নিজস্ব প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতার আলোকে একটি বড় কর্মসূচীতে পরিণত হয়েছিল। বলা যায় এই প্রথম ধাপে অর্থাৎ তিন বছরে কর্মসূচী পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছিল।

খ) সাংগঠনিক উন্নয়ন

এবার আমরা আলোকপাত করতে চাই সাংগঠনিক উন্নয়নের দিকে। ওটেপের মাধ্যমে ব্র্যাক কোন কোন দিকে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে পেরেছিল তা আমরা একে একে এখানে বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

কর্মী বৃদ্ধি

আমরা পূর্বেই জেনেছি যে ২ জন পুরুষ কর্মী ও ২০ জন মহিলা কর্মী নিয়ে ওটেপের যাত্রা শুরু। কিন্তু পরিকল্পনা মাফিক কাজ শেষ করতে হলে প্রয়োজন ছিল প্রচুর সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা কর্মী। তাছাড়া আরো দরকার প্রতিটা টিমে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন টিম লিডার ও কমপক্ষে ২/৩ জন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মহিলা কর্মী। তখনো পর্যন্ত মহিলারা দূর কর্মস্থলে চাকরী করতে অভ্যস্থ হয়ে ওঠেনি। তাই সিদ্ধান্ত হয় যে মহিলা কর্মী নির্বাচিত করতে হবে তার নিজের জেলা হতে। পক্ষান্তরে পুরুষ কর্মী নির্বাচিত হবে জাতীয় পর্যায়ে। আরো সিদ্ধান্ত হয় যে মহিলা কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে এস,এস,সি। ওটেপ প্রথম ধাপের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মহিলা কর্মীর সংখ্যা ৬০৮ এবং পুরুষ কর্মীর সংখ্যা ছিল ৩০০। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে দ্বিতীয় ধাপ ওটেপ চালানোর মত শক্তি ও যোগ্যতা ব্র্যাক প্রথম ধাপেই অর্জন করেছিল। অবশ্য এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য ব্র্যাককে খুব পরিকল্পনামাফিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হয়েছিল। কর্মসূচী শুরুর সাথে সাথেই তৈরী করা হয়েছিল অপারেশনাল প্ল্যান। যেখানে ঠিক করা হয়েছিল লক্ষিত বাড়ীতে শিক্ষাদানের জন্য কোন মাসে কতটা টিম এবং মহিলা কর্মী ও পুরুষ কর্মীর প্রয়োজন। এই পরিকল্পনামাফিক কর্মী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হত।

দক্ষ কর্মী তৈরী

দক্ষ কর্মী বাহিনী ছাড়া কোন কর্মসূচী সফলতার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব নয় এবং ঐ কর্মসূচীর উদ্দেশ্যেও পৌঁছানো যায় না। তাই প্রথম থেকেই ব্র্যাক এ ব্যাপারে মনোযোগী ছিল। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে সকল কর্মীকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে ব্র্যাক খুবই সতর্ক ছিল। কর্মসূচীর উপর ভাল ধারণা দেয়ার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে সবাইকে কর্মসূচীর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কৌশল ও এর বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা হতো। এরপর ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে মানবিক উন্নয়নের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হত। যেমন, যোগাযোগ স্থাপন, নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এ ছাড়াও ডায়রিয়ার উপর আধুনিক ধারণা ও উপায় জানার জন্য আইসিডিডিআর,বি থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হত। ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান আইসিডিডিআর,বি থেকে প্রশিক্ষণ পেত। মহিলা কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ ছিল অপরিহার্য। সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

করলেই শুধুমাত্র তাদের কাজে নিয়োজিত করা হত। কর্মসূচীর প্রথমদিকে শাল্লা প্রকল্পের মার্কুলীতে মনিটরদের ২ মাসের এক প্যারামেডিকেল প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ প্রশিক্ষণ দেন মনোরঞ্জন সরকার। অনুরূপ ২ মাসের আরেকটি প্যারামেডিকেল প্রশিক্ষণ দেয়া হয় মানিকগঞ্জের বেতিলা ক্যাম্পে। এ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ডাঃ রফিকুল ইসলাম। এ ছাড়া তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে কর্মীদের ঘাটতি ফিড-ব্যাক সভাতে বলা হত। কখনও কখনও তত্ত্বাবধায়ক নিজে বাস্তবায়ন করে কর্মীকে শিক্ষা দিত কি করে কাজটি করতে হবে। যেমন ভাতার সভা বা পুরুষ সভা। এ সভা পরিচালনার ভার দেয়া হত কর্মীর উপর এবং ঐ সভায় তত্ত্বাবধায়ক পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকত। সভাশেষে টিমে ফিরে তত্ত্বাবধায়ক কর্মীকে কোথায় কোথায় তার সমস্যা হয়েছে এবং কিভাবে সে সুন্দরভাবে সভাটি করতে পারত তা ব্যক্ত করত। এবং পরের আরেকটি সভাতে তত্ত্বাবধায়ক সভা পরিচালনা করত এবং কর্মীটি পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকত। সভাশেষে টিমে ফিরে তারা আবার আলোচনায় বসত এবং কর্মীটি কি শিখেছে তা জানতে চাওয়া হত। এভাবে প্রশিক্ষণ, তত্ত্বাবধান এবং নতুন তথ্য নিয়মিত সরবরাহ করে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়া নিয়মিত সাপ্তাহিক ও মাসিক মিটিংগুলো থেকেও কর্মীরা অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পেরেছে।

প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিম লীডার তৈরী

কর্মসূচী সম্প্রসারণের জন্য সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিম লীডার। টিম লীডার যদি সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিতে না পারে তাহলে কর্মসূচী বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দেয়। তাই কর্মসূচীতে সবচাইতে বেশী গুরুত্ব দেয়া হত টিম লীডার তৈরীর ব্যাপারে। পরিকল্পনা এমনভাবে তৈরী করা হয়েছিল যে প্রথমদিকে সম্প্রসারণের হার কম রেখে পরের দিকে তা বাড়ানো হয়েছিল। প্রথমদিকে ব্র্যাকের অন্য কর্মসূচী বিশেষ করে শাল্লা প্রকল্পের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মীদের নিয়ে টিম লীডারের দায়িত্ব দেয়া হত। পরে নতুন কর্মীদের কমপক্ষে এক বছর হলে এবং যোগ্যতা অর্জন করলে টিম লীডার হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হত। পরের দিকে অবশ্য দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য এ নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলা যায়নি। তখন কমপক্ষে ৬ মাস ওটেপে কাজ করলে এবং যোগ্যতা থাকলে তাকেও ওটেপের টিম লীডারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য এখানে অবশ্য কর্মসূচীর গুণগত মানের সাথে কিছুটা আপোষ করতে হয়েছে। দেখা গেছে অনেক টিম লীডার সঠিকভাবে টিমকে পরিচালনা করতে পারেনি। এবং কাজের গুণগত মানও বজায় রাখতে পারেনি। এমন অনেক উদাহরণও আছে যে কর্মীটি টিম লীডার হতে নারাজ কর্মসূচী সম্প্রসারণের জন্য তাকেও এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার্স কোর্স

প্রতিটা কর্মীর জন্য প্রশিক্ষণ ছিল আবশ্যকীয়। যাতে করে যে তথ্যই গ্রামে প্রচার বা জনগণকে শিক্ষা দেয়া হোক না কেন তা যেন একই রকম হয়। কোথাও যেন কোন বিভিন্নতা বা বিভ্রান্তি না থাকে। যখনই কর্মসূচীতে কোন পরিবর্তন আনা হয়েছে তখনই তা সবাইকে একইভাবে জানানোর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ ছাড়া কখনও কখনও রিফ্রেশার্স কোর্সের মাধ্যমে কর্মসূচীর পরিবর্তন সবাইকে জানানো হয়েছে। এগুলো অবশ্য দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতেও সাহায্য করেছে। যা পরবর্তীতে একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়ক হয়েছে।।

ওটেপ কালচার

ওটেপের নিজস্ব একটা কালচার ছিল (সংযোজনী-৩) যা কর্মীদের কাজের অনুপ্রেরণা যোগাত। যেমন- সকালে উঠে নাস্তা করে মহিলা কর্মীরা ৭.৩০ টার মধ্যে গ্রামে চলে যেত এবং কমপক্ষে ১০ জন মাকে শিখিয়ে বিকাল ৫.০০ টার দিকে টিমে ফিরত। এমনকি শীতকালেও মহিলা কর্মীরা খুব ভোরে উঠে সূর্য উঠার আগে গোসল সেরে নাস্তা করে ৭.৩০ টার মধ্যে গ্রামে রওনা হয়ে যেত। তাদের সাথে একজন পুরুষ কর্মী গ্রামে যেত। অপর পুরুষ কর্মীটি অন্যকাজে অন্য গ্রামে যেত। প্রতিদিনকার রিপোর্ট প্রতিদিন তৈরী করে রাখত। প্রতি বৃহস্পতিবারে টিমে সাপ্তাহিক মিটিং হত। মিটিং-এ বিভিন্ন সমস্যা, তার সমাধান ও ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে আলাপ আলোচনা হত। প্রতি সাড়ে ৩ মাস অন্তর ওটেপের সকল টিমের ১৫ দিনের ছুটি দেয়া হত। ছুটি দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল যাতে ছুটির পরে কর্মীরা নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করতে পারে। এছাড়া বিশেষ কারণ ব্যতীত সাধারণতঃ কোন ছুটি থাকত না। প্রতি দেড় মাস অন্তর নতুন ইউনিয়নে এবং প্রতি ৩/৪ মাস পর নতুন উপজেলাতে যেতে হত। থাকার ব্যাপারে কখনও স্কুল ঘর, কখনও ইউনিয়ন পরিষদ, কখনও গোডাউন, কখনও বা কারো বাড়ীতে অর্থাৎ যখন যেখানে যা পাওয়া গিয়েছে সেখানে সেভাবেই ওটেপের কর্মীরা থেকেছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে শুতে হয়েছে। কোন আসবাবপত্র যেমন খাট, আলনা, চেয়ার ইত্যাদি কখনও কোন টিমে দেওয়া হয়নি। ফলে লেখালেখির কাজ মাদুরে বসে করতে হয়েছে এবং কাপড়-চোপড় সাধারণতঃ ট্রাংকের উপরে রেখেছে। শীতকালে মেঝেতে খড় বিছিয়ে তারপরে মাদুর পেতে কর্মীরা শুয়েছে। গরমকালে যে সকল টিম গোডাউনে থেকেছে সে সব টিমের কর্মীদের সারা গা ঘামাচিতে ভরে যেত এবং পা ব্যাঙের গায়ের মত খসখসে হয়ে যেত। থাকার ব্যাপারে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে চাই। বানিয়াচংয়ের একটি এলাকার মহিলা কর্মীদের কাজ দেখার জন্য আমি গিয়েছিলাম। রাতে আমাকে টিমে থাকতে হয়। তখন সিলেট অঞ্চলে একটু একটু শীত পড়েছে। রাতে আমি ও টিম-ইন-চার্জ আবুবকর সিদ্দিক (বর্তমানে সে ব্র্যাকে কর্মরত নেই) ঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে বিছানা করে শুয়ে পড়লাম। একটু একটু শীত ছিল বলে গায়ে কাঁথা দিয়ে শুয়েছিলাম। ভোরের দিকে উঠে দেখি আমার কাঁথা ও লুঙ্গি সব ভেজা। আমি সসঙ্কোচে টিম-ইন-চার্জকে জিজ্ঞাসা করলাম, এর কারণ কি ? সে বলল, তারও একই ঘটনা ঘটেছে। পরে আমরা লক্ষ্য করলাম যে আমাদের পাশেই গরু বাধা আছে এবং তাদের মলমূত্রেই আমাদের কাঁথা এবং লুঙ্গি সব ভিজে একাকার। তারপর বিপদে পড়লাম মলমূত্র ত্যাগ করা নিয়ে। একটা পায়খানা আছে। তার সামনে চট দিয়ে ঢাকা। ফলে একজন পায়খানায় গেলে সামনে আরেকজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। অন্যদিকে একই পায়খানায় মহিলা কর্মীরাও যাচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে সিদ্দিককে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে আমি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সমাধা করলাম। এ প্রসঙ্গে আর একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা না করে পারছি না। আমি ও মুজাফ্ফর রব বানিয়াচং-এর শতমুখা গ্রামে গেছি ওটেপের কাজ দেখতে। সারাদিন কাজ দেখার পর রাতে আমাদের টিমে থাকতে হয়। টিমে সেদিন আমরা ২ জন মেহমান, ২ জন টিম-কোঅর্ডিনেটর সিদ্দিক ও কামরুল ইসলাম এবং ৭/৮ জন মহিলা কর্মী। এই মহিলা কর্মীদের মধ্যে আবার একজন ছিল সিদ্দিকের বৌ। সমস্যা দেখা দিল রাতে শোয়া নিয়ে। কারণ ঘর মাত্র একটি এবং সেই ঘরে আছে একটি মাত্র খাট। সেদিন যেভাবে ঐ সমস্যার সমাধান করা

হয়েছিল আমি এখন তার বর্ণনা দিচ্ছি। খাটে শুলাম আমি, মুশফিকুর রব ও কামরুল। আমাদের খাটের গা ঘেসে শাড়ী টানিয়ে পর্দা সৃষ্টি করে তারই পাশে মেঝেতে বৌ ও বাচ্চা নিয়ে শুয়ে থাকল সিদ্দিক। তাদেরই পাশে আবার শাড়ী দিয়ে আরেকটি পর্দা সৃষ্টি করে মেঝেতে শুয়ে থাকল মহিলা কর্মীরা। সব চাইতে বড় সমস্যা দেখা দিল রাতে প্রকৃতির ডাকে বাইরে যাওয়া নিয়ে। কারণ ঘরের দরজা পড়েছে সিদ্দিক ও তার বৌ যেখানে শুয়ে আছে তার সামনে। ফলে আমরা যারা খাটে শুয়ে তাদের বাইরে যেতে হলে সিদ্দিক ও তার বৌকে ডিঙিয়ে দরজা খুলে বাইরে যেতে হবে। কিন্তু এ কাজটি করা খুবই দুরূহ ও লজ্জাকর ব্যাপার। তাই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য পাশের এক জানালা দিয়ে লাফ মেরে সে রাতে বের হয়েছিলাম।

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ

ওটেপের প্রথম ধাপেই জাতীয় পর্যায়ে কাজ করার জন্য যত রকমের জিনিষপত্র প্রয়োজন তা সংগ্রহ করা হয়ে গিয়েছিল। যেমন- হাঁড়ি-পাতিল, বাসন-কোসন, মগ, ব্যাগ, ফ্লিপচার্ট, সাইকেল, মটর সাইকেল, পরীক্ষাগারের যাবতীয় উপকরণ ইত্যাদি। যে কোন সংগঠন সম্প্রসারণ বা তার কর্মপরিধি বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সংগ্রহ অপরিহার্য এবং এটা একটা সাংগঠনিক শক্তি হিসেবে বিবেচিত। ব্র্যাক প্রথম ধাপেই এই শক্তি অর্জন করেছিল।

অন্যান্য সংস্থার সাথে সম্পর্ক

ব্র্যাক ওটেপের প্রথম ধাপেই সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়ার জন্য যেসব সংস্থার সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত তা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। যেমন, সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ এবং আইসিডিডিআর,বি। এই দুই সংস্থা থেকে ওটেপের কর্মীরা প্রচুর সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছে। যেমন- আইসিডিডিআর,বি থেকে প্রশিক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ে গবেষণাগার স্থাপন এবং মা কর্তৃক বানানো স্যালাইন বিশ্লেষণ ইত্যাদি। স্বাস্থ্যবিভাগের ডাক্তাররা থানাতে ডাক্তারদের সভায় গিয়ে লবণ-গুড়ে স্যালাইনের পক্ষে বক্তব্য রেখেছে এবং প্রচারণায় সাহায্য করেছে।

টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজরী কমিটি

কর্মসূচীর কারিগরী ক্ষেত্রে পরামর্শদানের জন্য কারিগরী পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমিটিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছিল। তারা মাঝে মাঝে বসতেন এবং কর্মসূচীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতেন। কমিটি সদস্যদের নামের তালিকা সংযুক্ত করা হল (সংযোজনী-২০)।

গ) ব্যবস্থাপনা ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির উন্নয়ন

সাংগঠনিক কাঠামো

সঠিকভাবে কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য টিম, এলাকা ও অঞ্চল ভিত্তিতে কর্মকাণ্ডাধীন এলাকাকে ভাগ করা হয়েছিল। বাস্তবায়নের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এলাকা অফিস। একটি এলাকাতে একই সাথে ৩টি উপজেলাতে কাজ চলত। প্রতি উপজেলাতে আবার ৩টি ও.আর.ডাব্লিউ টিম কাজ করত। ও.আর.ডাব্লিউ টিমের কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল একজন টিম কো-অর্ডিনেটর (টি.সি)। এলাকার কাজ দেখাশোনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিল একজন এলাকা ব্যবস্থাপক। প্রতিটি উপজেলাতে ও.আর.ডাব্লিউর কাজ মনিটর ও অন্যান্য কাজগুলোকে রিইনফোর্স করার জন্য ছিল একটি করে টিম। এরকম একটি এলাকা অফিসে ৩টি রি-ইনফোর্সমেন্ট টিম নিয়োজিত ছিল। কর্মসূচী যখন বিস্তার লাভ করে তখন একসাথে ১০টি এলাকাতে ৯০টি ও.আর.ডাব্লিউ টিম ও ৩০টি রিইনফোর্সমেন্ট টিম কাজ করত।

কাজের গুণগত মানের উপর বেতন নির্ধারণ

ওটেপের ব্যবস্থাপনায় সবচাইতে যে সিদ্ধান্তটি বা পদ্ধতি বিশেষভাবে সাহায্য করেছে তাহল মহিলা কর্মীদের কাজের গুণগত মানের উপর তাদের বেতন নির্ধারণ (সংযোজনী-১৪)। গ্রামের মায়েদের শেখানোর দায়িত্ব ছিল মহিলা কর্মীদের এবং তাদের সংখ্যাই ছিল বেশী। বেতন নির্ধারণের পদ্ধতির জন্য মহিলা কর্মীদের আপনা থেকেই গ্রামে যেতে হত এবং কমপক্ষে প্রতিদিন ১০ জন মাকে শেখাতে হত। অপরপক্ষে শেখানোর সময় মায়েদের ভালভাবে শেখাতে হত। কারণ মনিটরিং গ্রেডে কাজের মান নিম্নমানের নির্ধারিত হলে বেতন কমে যেত (শতকরা ১০ ভাগ কাজ মনিটর করা হত)। তাই বেতন যাতে বেশী পায় সেজন্য সকল মহিলা কর্মী অত্যন্ত সচেষ্ট থাকত। সাধারণতঃ গ্রামে যাওয়া বন্ধ না রেখে প্রতিদিন অন্ততঃ ১০ জন মাকে শেখাতো। এবং আন্তরীকতার সাথে কাজ করতো। কাজের পরিমাণ ও মানের সাথে বেতন সংযুক্ত করায় মহিলা কর্মীদের তত্ত্বাবধানের কাজ বহুলাংশে কমে গিয়েছিল এবং মহিলা কর্মীদের কাজের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের চাইতে মহিলা কর্মীদের মাথাব্যথা ছিল অধিকতর। মহিলা কর্মীরা মাসে গড়ে ২০ দিন কাজ করত এবং ২০০ জন মাকে শেখাতো। এতে করে প্রথমদিকে মহিলা কর্মী মাসে ৫০০-৬০০ টাকা বেতন পেত। পরের দিকে অবশ্য গ্রেড প্রতি টাকার হার বাড়ানোর জন্য তারা মাসে ৮০০-৯০০ টাকা পেত।

মনিটরিং

নিয়মিত মনিটরিং (সংযোজনী-১৫) করার প্রথা চালু থাকার জন্য কর্মসূচীর গুণগত মান বজায় রাখা সম্ভব হত। কারণ মনিটরিং-এর ফলাফল পাওয়ার পর তা টিমকে প্রদান করা হত। এবং কোন মহিলা কর্মীর কোথায় ত্রুটি আছে তা ঐ মহিলা কর্মীকে শুধরে নেবার জন্য বলা হত (সংযোজনী-১৬)। ফলে, মহিলা কর্মীদের উন্নয়ন তথা কর্মসূচীর গুণগত মান বজায় রাখার জন্য মনিটরিং উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। কর্মীরাও সবাই কাজ ভাল করার জন্য সচেষ্ট থাকত। কারণ সবাই জানত যে নিয়মিত তাদের কাজকে মনিটর করা হচ্ছে। কিন্তু মনিটররা কোন্ মহিলা কর্মীর কাজ মনিটরিং করছে তা বুঝতে পারত না। কারণ এলাকা ব্যবস্থাপক প্রত্যেক কর্মীর জন্য প্রতি মাসে একটি গোপনীয় কোড ব্যবহার করত এবং এই কোডটি এলাকা ব্যবস্থাপক ছাড়া আর

কেউ জানতে পারত না। এলাকা ব্যবস্থাপক এ কোড মনিটরিং শীটে ব্যবহার করত। ফলে বিশেষ কোন মহিলা কর্মীর কাজের ব্যাপারে মনিটরদের পক্ষপাতিত্ব করার কোন সুযোগ ছিল না। মনিটরদের কি কাজ হবে এবং কিভাবে করতে হবে পরবর্তীতে তার উপর একটা নির্দেশিকা তৈরী করা হয়েছিল এবং তা প্রতিটা মনিটরকে সরবরাহ করা হয়েছিল।

পরিকল্পনা

সুষ্ঠু পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের একটি অপরিহার্য অংশ। ওটেপকে বাস্তবায়িত করার জন্য জেলা, উপজেলা পর্যায়ে কোন মাসে কত টিম থাকবে এবং কতজন মাকে শিক্ষা দেবে সে পরিকল্পনা কর্মসূচীর শুরুতেই তৈরী করা হয়েছিল। এই টিম এবং মাকে শিক্ষাদানের পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে তৈরী করা হয়েছিল কর্মী নিয়োগ ও এলাকা অফিস বাড়ানোর পরিকল্পনা। এবং এই কর্ম পরিকল্পনার সাথে মেলানো হত মাসিক অগ্রগতির রিপোর্ট। কোন টিম বা এলাকা শিক্ষাদানের ব্যাপারে পরিকল্পনার চাইতে এগিয়ে বা পিছিয়ে থাকলে সে অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করত। ফলে ওটেপে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করা সম্ভব হয়েছিল।

তত্ত্বাবধায়ন

যেহেতু মহিলা কর্মীদের কাজের গুণগত মান নির্ধারিত হত মনিটরিং ও গবেষণাগারের রিপোর্ট দ্বারা, তাই তত্ত্বাবধায়নের সময় অন্য কতকগুলো বিশেষ দিক দেখার জন্য বলা হত। এ দিকগুলো মনিটরিং ও গবেষণাগারের রিপোর্টে আসত না। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মহিলা কর্মীরা মায়ের পাত্রে দাগ কাটে কিনা, মা নিজের হাতে লবণ-গুড়ের স্যালাইন তৈরী করে কিনা, বানানো স্যালাইন মহিলা কর্মী এবং মা খেয়ে দেখে কিনা, শেখানোর সময় ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করে কিনা, বিপদের কথা ঠিকমত মাকে বুঝিয়ে বলে কিনা ইত্যাদি (সংযোজনী-৬)। কমপক্ষে একজন মহিলা কর্মীর ৩ জন মাকে শেখানোর কাজ দেখতে হত। তারপর কোনো ফিড-ব্যাক থাকলে তা মহিলা কর্মীদের ডায়েরীতে লিখে দিতে হত। কিভাবে তত্ত্বাবধায়ন এবং কি তত্ত্বাবধায়ন করতে হবে তার উপর কর্মীদের পরিষ্কার ধারণা দেয়ার জন্য পরবর্তীতে অবশ্য একটা গাইড বই রচনা করা হয়েছিল।

রিপোর্টিং

রিপোর্টিং পদ্ধতি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছিল যে কোথাও কেউ কোন ভুল তথ্য প্রদান করলে তা সহজেই ধরা যেত। মহিলা কর্মীরা ডায়েরী থেকে তথ্য নিয়ে প্রতিদিন তাদের রিপোর্টিং ফরম পূরন করতো। সপ্তাহান্তে তা জমা দিত টিম লীডারের কাছে। টিম লীডার সমগ্র তথ্য একত্রিত করে মহিলা কর্মীদের রিপোর্টসহ এলাকা অফিসে পাঠিয়ে দিত (সংযোজনী-১৭)। এলাকা অফিস এলাকার রিপোর্ট তৈরী করে আঞ্চলিক অফিসে পাঠিয়ে দিত। আঞ্চলিক অফিস আঞ্চলিক রিপোর্ট তৈরী করে কর্মসূচী ব্যবস্থাপকের কাছে পাঠাত। এলাকা অফিস থেকে র‍্যান্ডাম স্যাম্পলিং-এর মাধ্যমে প্রতিটি মহিলা কর্মীর ৬% কাজ মনিটরিং-এর জন্য মহিলা কর্মীদের কোড নম্বর ব্যবহার করে তা মনিটরদের কাছে দেয়া হত। এখানে বলে রাখা ভাল যেহেতু মনিটর টিমকে মনিটরিংয়ের পাশাপাশি রিইনফোর্সমেন্টের অন্যান্য কাজ দেওয়া হয়েছিল তাই পরবর্তীতে ১০% থেকে নামিয়ে

মনিটরিং-এর কাজ ৬৯ এ আনা হয়েছিল। মনিটরিং রিপোর্ট পাওয়ার পর এলাকা অফিস তা থেকে প্রতিটি মহিলা কর্মীর ফিড-ব্যাক রিপোর্ট তৈরী করে টিমে পাঠাত। রিপোর্টিং থেকে আরো ধরা পড়ত কোন গ্রামে কতটা পরিবার শেখানো থেকে বাদ পড়ে গেছে। বাদপড়া পরিবারকে শেখানোর জন্য তখন আবার কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করত। রিপোর্টিং থেকে আরো ধরা পড়ত কোন্ মহিলা কর্মী, কোন্ টিম বা কোন্ এলাকা পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে আছে।

সাপ্তাহিক ও মাসিক সভা

টিমে প্রতি সপ্তাহে টিমের মহিলা কর্মী ও পুরুষ কর্মীদের নিয়ে এক সভা হত। সভায় তারা ঐ সপ্তাহে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা আলোচনা করত এবং পরবর্তী সপ্তাহের কাজের পরিকল্পনা করত। মাসিক সভা হত আঞ্চলিকভিত্তিক যেখানে টিম লীডার, এলাকা ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এবং কখনও কখনও কর্মসূচী ব্যবস্থাপক উপস্থিত থাকতেন। এই আঞ্চলিক সভায় এলাকা ও টিমের কাজের মনিটরিং করা হত এবং বিভিন্ন টিমের ও এলাকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কর্মসূচীর নতুন নতুন কলাকৌশল, উপাদান ও কার্যক্রম হাতে নেয়া হত। অর্থাৎ কর্মসূচীর উন্নয়ন ও পলিসি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সাধারণতঃ এই আঞ্চলিক সভাগুলোতে নেয়া হত। এই মাসিক সভাগুলোতে অনেক নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্যও প্রদান করা হত। ফলে, বলা চলে, শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনা ও কর্মসূচী উন্নয়নই কেবল ঐ সভাগুলোর উদ্দেশ্য ছিল না। সভাগুলোর মাধ্যমে কর্মী উন্নয়নের কাজও যথেষ্ট করা হয়েছে। অর্জিত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জনগণের কাছ থেকে কর্মীরা বিভিন্নমুখী ধারণা লাভ করেছে। যে সকল ধারণা ঐ সভাগুলোতে আলোচনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে ঐকমতের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং কর্মসূচীর উত্তরণ ঘটেছে। তাই বলা চলে ওটেপে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি ছিল অংশগ্রহণমূলক এবং Bottom-up.

লজিস্টিকস

ওটেপ কর্মসূচী ছিল ব্র্যাকের একটি জাতীয় কর্মসূচী। তাই কর্মসূচীটি আকারে ছিল অন্যান্য কর্মসূচী থেকে অনেক বড়। এই কর্মসূচীতে বিভিন্ন জিনিসপত্রাদির সরবরাহ নিশ্চিত করা ছিল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের আর একটি বড় দায়িত্ব। বাজেট ও ফাণ্ড নিয়ন্ত্রণ এবং মালামালের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয়ভাবে জিনিসপত্র কেনাকে নিরুৎসাহিত করে কেন্দ্রীয়ভাবে সরবরাহ নিশ্চিত করার উপর বেশী জোর দেয়া হয়। এলাকা অফিস থেকে জিনিসপত্রের চাহিদা নির্ণয় করে তা প্রধান কার্যালয়ে কমপক্ষে একমাস আগে পাঠাতে হত। চাহিদাপত্র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এবং কর্মসূচী ব্যবস্থাপক কর্তৃক অনুমোদিত হবার পর লজিস্টিকস বিভাগ তা কেনার পদক্ষেপ নিত এবং পরবর্তী মাসে এলাকা অফিস প্রধান কার্যালয়ে লজিস্টিকস বিভাগ থেকে তাদের চাহিদার জিনিসপত্র নিয়ে যেত। পরবর্তীতে আরো নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্য মাসে একটি এলাকা অফিসে কি কি জিনিসপত্র লাগতে পারে তার একটা সুনির্দিষ্ট তালিকা তৈরী করে সব এলাকা অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং এলাকা অফিসগুলো ঐ তালিকাতে বরাদ্দকৃত জিনিসের অতিরিক্ত কোন জিনিস নিতে পারত না।

ফাইল ইনডেক্স

১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাস। মৌলভীবাজার এরিয়া অফিসের এলাকা ব্যবস্থাপক তখন মুসব্বিরুর রব চৌধুরী। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার অফিসের জন্য কতটা ফাইল খুলেছেন। উত্তরে উনি বললেন, ৩০ টা। তার পরের মাসেই গেলাম যশোর এলাকা অফিসে। সেখানকার এলাকা ব্যবস্থাপক তখন আবুবকর সিদ্দিক (উনি এখন ব্র্যাকে কর্মরত নেই)। উনাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, উনি খুলেছে ৯০টা। তখন চিন্তা করলাম যদি কেন্দ্রীয়ভাবে কোন একটা কিছু করা না যায় তাহলে যখন একসাথে ১০টি এলাকা অফিসের কাজ চলবে এবং এলাকা ব্যবস্থাপকরা বদলি হবে তখন কাগজপত্র খুঁজে বের করা খুব মুশকিল হবে। এছাড়া কর্মসূচী ব্যবস্থাপক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকরাও পুরনো কোন কাগজপত্র এলাকা অফিস থেকে খুঁজে বের করতে পারবে না। তখন থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে এই ওটেপ কর্মসূচীতে যা কিছু করা হবে তা কেন্দ্রীয়ভাবে করা উচিত। স্থানীয়ভাবে করার ক্ষমতা বা অধিকার দিলে কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণ করা ও কর্মসূচীর গুণগত মান রক্ষা করা খুবই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তাই পরবর্তীতে ওটেপের জন্য একটা ফাইল ইনডেক্স তৈরী করা হয় এবং সবকিছুই কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হত। পরবর্তীতে এই সিদ্ধান্ত কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপের প্রস্তুতিপর্বে চিন্তা ভাবনা

ওটেপের প্রথম ধাপ জাতীয় পর্যায়ের কর্মসূচীর জন্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ধাপেই কর্মসূচীর উন্নয়ন, সাংগঠনিক উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ কর্মী তৈরী ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য যে সকল জিনিসপত্র দরকার তা সবই নিশ্চিত করা হয়েছিল। প্রথম ধাপ বাস্তবায়নের পর ব্র্যাক কর্মীদের এই আত্মবিশ্বাস জন্মেছিল যে তারা বাংলাদেশের প্রতিটি বাড়ীতে ব্র্যাক উদ্ভাবিত ডায়রিয়া ব্যবস্থাপনার বার্তাগুলো পৌঁছে দিতে পারবে। ইতোমধ্যে অর্থাৎ ১৯৮৩ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসের দিকে বহিরাগত টিম কর্তৃক ওটেপ কর্মসূচীর কাজের মূল্যায়ন করা হয়। এই টিমে ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রিচার্ড ক্যাশ, আইসিডিডিআরবিতে কর্মরত এক ভারতীয় মহিলা সুষম ভাটিয়া ও Swiss Development co-operation এর ইমিতা করনাজ। মূল্যায়নেও দেখা যায় যে প্রায় ৮৯% লোক ডায়রিয়া ব্যবস্থাপনার বার্তাগুলো জানে এবং কিভাবে লবণ-গুড়ের স্যালাইন বানাতে হয় তাও জানে। এই মূল্যায়নের ফলাফল ওটেপের কাজ সম্প্রসারণে এবং দ্বিতীয় ধাপ গ্রহণে ব্র্যাককে উৎসাহিত করে। কিন্তু ঐ সময় ওটেপের সকল কর্মী এবং বহিরাগত মূল্যায়ন টিমের সদস্যরা সবাই দুটি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেয়। প্রথমটি হল ডায়রিয়া সম্পর্কে জনগণের ধারণা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক । কিন্তু সে অনুপাতে লবণ-গুড় স্যালাইনের ব্যবহার সন্তোষজনক নয়। কর্মসূচীর কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটালে ব্যবহার বাড়ানো সম্ভব হবে? আর শুধুমাত্র ডায়রিয়ার উপর কাজ করে কি শিশু মৃত্যুর হার সন্তোষজনক পর্যায়ে কমিয়ে আনা সম্ভব? এ দুটো প্রশ্নে দ্বিতীয় ধাপে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়।

ঐ সব প্রশ্ন ও চিন্তাভাবনা থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে লবণ-গুড় স্যালাইনের ব্যবহার বাড়াতে হলে একই জায়গায় দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে হবে। যেহেতু একই জায়গায় দীর্ঘদিন থাকতে হবে, ফলে শুধুমাত্র ডায়রিয়ার উপর কাজ না করে শিশু মৃত্যুর জন্য অন্যান্য যে কারণগুলো বিরাজমান সে সকল কাজ করা যেতে পারে। আরো সিদ্ধান্ত হয় যে ওটেপের দ্বিতীয় ধাপে একই জায়গায় দীর্ঘদিন অবস্থান এবং ডায়রিয়ার সাথে স্বাস্থ্য কর্মসূচীর অন্যান্য উপাদানের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে যে লবণ-গুড় স্যালাইনের ব্যবহার বাড়ে কিনা এবং শিশু মৃত্যুর হার কমানো যায় কিনা!

ওটেপের দ্বিতীয় ধাপ (অক্টোবর ১৯৮৩ - সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬)

ওটেপের দ্বিতীয় ধাপে বাংলাদেশের বৃহত্তর ৮টি জেলাতে ডায়রিয়ার বার্তাগুলো শেখানো হয়। জেলাগুলো হল : ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, বরিশাল, পটুয়াখালী এবং জামালপুর (সংযোজনী-১)। নোয়াখালী বাদে অন্য ৭টি জেলার ১৫০টি উপজেলার প্রতিটি থেকে ১টি করে ইউনিয়ন নিয়ে ১৫০টি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কর্মসূচীর অন্যান্য উপাদানের উপর পরীক্ষামূলক প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। এই পরীক্ষামূলক অংশের নাম দেয়া হয়েছিল Concentrated Reinforcement Programme (CRP)। CRP শুরুর পূর্বে ওটেপের প্রথম ধাপে অর্থাৎ খুব সম্ভবতঃ ১৯৮৩ সালের মার্চ/এপ্রিল মাসে কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলাতে Concentrated Reinforcement Team (CRT) নামে একটি টিম ছয়মাস কাজ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল CRP তে

কি কি কাজ হবে এবং কিভাবে তা করতে হবে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। কি কি কাজ ও কাজের পদ্ধতি কি হবে তা নির্ধারিত হওয়ার পর ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাস থেকে শুরু হয় CRP'র কাজ। প্রতিটি উপজেলা থেকে ১টি করে ইউনিয়নে সি,আর,পির কাজ করার পিছনে যুক্তি ছিল, যদি দীর্ঘদিন অবস্থান ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় কাজের ফলে লবণ-গুড় স্যালাইনের ব্যবহার বাড়ানো যায় তাহলে ঐ ইউনিয়ন থেকে অন্যান্য ইউনিয়নেও এই খবর ছড়াবে এবং অন্যান্য ইউনিয়নের জনগণের লবণ-গুড় স্যালাইনের উপর বিশ্বাস বাড়বে ও তারা তা ব্যবহার করতে উৎসাহিত বোধ করবে। যার জন্য সিদ্ধান্ত হয় যে সি,আর,পি ইউনিয়নটি হতে হবে উপজেলার মাঝখানে যাতে স্যালাইন ব্যবহারের খবর দ্রুত ছড়ায়।

সি,আর,পি টিমে থাকত ৩ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা কর্মী। তারা ঐ নির্বাচিত ইউনিয়নে ৬ মাস ধরে কাজ করত। ডায়রিয়ার উপর শিক্ষা দেয়া ছাড়া আর যে সকল কাজ তারা করত তাহল ঃ গ্রামে স্বাস্থ্য সেবিকা তৈরী করা, ধাত্রী প্রশিক্ষণ, ব্যক্তি ও জনস্বাস্থ্যের উপর শিক্ষা, নবজাত শিশুকে কলস্ট্রাম খাওয়ানো ও বাচ্চাদের বাড়তি খাবারের পরামর্শদান ইত্যাদি। এছাড়া ডায়রিয়ার উপরে প্রথম ধাপে যে সকল কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সবই দ্বিতীয় ধাপে করা হত। সি,আর,পি এলাকাতে টিমে ডায়রিয়া চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হত। রোগী এলে প্রথমে লবণ-গুড় স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসা এবং প্রয়োজনে I.V. Saline ব্যবহার করা হত। উপজেলা পর্যায়ে একটি করে ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠন করা হত।

পরবর্তীতে মনিটরিং-এর মাধ্যমে দেখা যায় যে লবণ-গুড় স্যালাইন ব্যবহার সি,আর,পি ইউনিয়নগুলোতে কিছুটা বাড়ানো সম্ভবপর হয়েছিল। ব্যবহারের হার ছিল ৪৭%। কিন্তু ব্যবহারের হার যতটা আশা করা গিয়েছিল তা হয়নি। অপরপক্ষে ঐ ইউনিয়নগুলোর impact অন্য কোন ইউনিয়নগুলোতে ততটা পড়েনি।

ওটেপের এই ধাপে CRP ছাড়া আর যে বিশেষ কাজটি করা হয়েছিল তা হল ওটেপের প্রথম ধাপে যে সকল এলাকাতে ORW টিমের সদস্য সংখ্যা বেশী হওয়ার জন্য দীর্ঘদিন অবস্থান সম্ভব হয়নি সে সকল এলাকায় ORT এর কাজকে Reinforce করা। কাজ ছিল গ্রামে গ্রামে পুরুষ সভার আয়োজন করে লবণ-গুড় স্যালাইনের উপর পুনঃ শিক্ষা প্রদান। এ কাজ করার জন্য ৪ সদস্য বিশিষ্ট পুরুষ কর্মীদের সমন্বয়ে বেশ কতকগুলো টিম গঠন করা হয়েছিল। এই টিমগুলোকে প্রথমে বলা হত Special Reinforcement Team (SRT)। ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৮৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঐ টিমগুলো প্রতি ইউনিয়নে ৮/১০ দিন ধরে কাজ করেছে। পরে অবশ্য এই কাজকে বলা হত Special Reinforcement Programme (SRP)। এ কাজ অবশ্য করা হয়েছিল সিলেট বাদে প্রথম ধাপের অন্যান্য জেলাগুলোতে যেমন -- ফরিদপুর, যশোর ও খুলনা।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ডায়রিয়া কর্মসূচীর পূর্ণতাপ্রাপ্তির জন্য যতটুকু উন্নয়নের দরকার ছিল তা ওটেপের প্রথম ধাপেই করা হয়েছিল। ফলে দ্বিতীয় ধাপে ডায়রিয়া কর্মসূচীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিসের উপর নজর দেয়া হয় এবং বেশীর ভাগই ছিল যে বার্তাগুলো শেখানো হত তার উপর। অর্থাৎ

বলা যায় দ্বিতীয় ধাপে ডায়রিয়া কর্মসূচীর fine tuning করা হয়। শেখানোর পদ্ধতির উপরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। একজন একজন করে শেখানোর পরিবর্তে দলগতভাবে শেখানোর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এছাড়া, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিভিন্ন উপাদানের উপর ব্র্যাক কাজ করতে সক্ষম কিনা তারও সম্ভাবনা যাচাই করা হয়। যে সব বিষয়ের উপর বিশেষ নজর দেয়া হয় তা এক এক করে বর্ণনা করা হল।

৭ পয়েন্টের পুনঃ নিরীক্ষণ

আমাশয়ে লবণ-গুড় স্যালাইনের ব্যবহার

প্রথমে ডায়রিয়া হলে স্যালাইন ব্যবহারের কথা বলা হত। ফলে দেখা গেছে আমাশয় হলে জনগণ লবণ-গুড় স্যালাইন ব্যবহার করত না। কিন্তু আমাশয়ে জলশূন্যতা রোধের জন্য লবণ-গুড় স্যালাইন ব্যবহার করা উচিত। তাই দ্বিতীয় ধাপে মায়েদের শেখানোর সময় ডায়রিয়ার পাশাপাশি বলা হত, আমাশয় হলে জলশূন্যতা রোধের জন্য লবণ-গুড়ের স্যালাইন খাওয়ানো উচিত (সংযোজনী ২.৩)। তবে সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শও নেয়া উচিত এটাও বলা হত।

বুকের দুধ খাওয়ানোর নিয়ম

পূর্বে বলা হত বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর আগে বুনি (স্তনবৃন্ত) পরিস্কার করে খাওয়াতে হবে। কিন্তু দেখা গেল গ্রামের মায়েরা ময়লা আবর্জনা নাড়াচাড়া করে এসে ঐ ময়লা হাত দিয়ে বুনি মুছে বাচ্চাকে দুধ পান করায়। এতে করে যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বুনি পরিস্কার করার কথা বলা হত তা ব্যহত হত। তাই পরে শেখানোর সময় বলা হত বুনি হাত দিয়ে পরিস্কার না করে সরাসরি বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো যাবে (সংযোজনী-২.৩)।

পায়খানা হতে এসে সাবান বা ছাই দিয়ে হাত ধোয়া

ডায়রিয়া যাতে না ছড়ায় তারজন্য দ্বিতীয় ধাপে পায়খানা হতে এসে হাত ধোয়ার উপর বেশী জোর দেয়া হয়। পারলে সাবান না পারলে ছাই দিয়ে হাত ধোয়ার পরামর্শ দেয়া হত (সংযোজনী-২.৩)। সাথে সাথে বদনা ডান হাতে ধরার পরামর্শও দেয়া হত। কারণ বাম হাতে বদনা ধরলে বদনার মাধ্যমে জীবাণু ছড়াতে পারে।

জলশূন্যতার লক্ষণ

ডায়রিয়ায় বেশীরভাগ লোক মারা যায় জলশূন্যতার জন্য। তাই জলশূন্যতা রোধ করা ডায়রিয়া ব্যবস্থাপনার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলে এই ধাপে মায়েদের শেখানোর সময় ভালভাবে জলশূন্যতার লক্ষণগুলো বুঝানো হত। যাতে করে মায়েরা নিজেরাই বুঝতে পারে কখন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

পানি, গুড় ও লবণের পরিমাণ সঠিক রাখা

প্রথমে শুধুমাত্র লবণের পরিমাণ যাতে বেশী না হয় তা বলা হত এবং বেশী হলে যে বিপদজনক তা বোঝানো হত। এতে দেখা গেল মায়েরা লবণের ব্যাপারে বেশী সচেতন হয়ে পড়ে এবং মাপের সময় লবণ কম দেয়। তাতে করে স্যালাইনে যে পরিমাণ লবণ থাকার কথা তার চাইতে লবণের পরিমাণ কম হত। তারপরে জোর দেয়া হল পানির পরিমাণ যেন ঠিক থাকে। পানির ব্যাপারে বেশী সচেতন হওয়ার ফলে তখন দেখা গেল পানিও কম দেয়। ফলে লবণের পরিমাণ স্যালাইনে বেড়ে যেতে লাগল এবং তা কখনও কখনও বিপদজনক অবস্থায় চলে যেত। পরে সিদ্ধান্ত হয় যে এসব জটিলতা দূর করতে হলে তিনটি উপাদানেরই পরিমাণ যাতে সঠিক হয় তার উপর জোর দিতে হবে (সংযোজনী-২.২)।

চিনির ব্যবহার

প্রথম ধাপে মায়েদের শেখানো হত সেলাইন বানাতে গুড় ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু মনিটরিং টিম স্যালাইন ব্যবহারের উপর জরিপ চালিয়ে লক্ষ্য করে যারা স্যালাইন ব্যবহার করত না তার কারণ অনেকের বাড়ীতেই গুড় নাই বলে তারা ব্যবহার করে না। পরবর্তীতে রিসার্চ বিভাগকে বাড়ীতে গুড়ের প্রাপ্যতা সম্পর্কে জরিপ চালানোর দায়িত্ব দেয়া হয়। এবং অনুসন্ধানের ফলাফলে দেখা যায় গুড়ের মৌসুমে প্রায় ৫০-৬০% লোকের ঘরে গুড় থাকে। কিন্তু যখন গুড়ের সময় নয় তখন শুধুমাত্র ২৫% লোকের ঘরে গুড় থাকে। এই ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে গুড়ের পরিবর্তে চিনি ব্যবহারের কথা বলতে হবে (সংযোজনী-২.৩)। কারণ অনেক বাড়ীতে গুড় না থাকলেও চিনি থাকতে পারে। যেহেতু গুড়ের কথা বলা হয় তাই তাদের ঘরে চিনি থাকা সত্ত্বেও তারা তা ব্যবহার করে না।

ঝোলা গুড়ের ব্যবহার

বর্ষার সময় কাজ করতে যেয়ে দেখা গেল অধিকাংশ বাড়ীতে যে গুড় পাওয়া যায় তা ঝোলা অর্থাৎ তরল। যেহেতু শিখানো হত একমুঠি গুড় তাই যাদের ঘরে শক্ত গুড় থাকত না কিন্তু ঝোলা গুড় থাকত তারা বিপদে পড়ত। কারণ ঝোলা গুড় মুঠি করা যায়না। তাই তখন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে স্যালাইন বানানোতে ঝোলা গুড়ের ব্যবহারের কথা বলতে হবে। তখন শিখানো হত যে হাতের তালুতে ঝোলা গুড় আস্তে আস্তে ঢালতে হবে এবং আঙুলের দ্বিতীয় দাগ পর্যন্ত গেলেই তা আধাসের পানিতে মিশাতে হবে। লবণের পরিমাণ অবশ্য একই থাকবে অর্থাৎ এক চিমটি।

পানিতে ফিটকিরির ব্যবহার

বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলায় দেখা গেল লোকজন পানীয় জলের জন্য বিশেষ পুকুর রিজার্ভ রাখে। এবং ঐ পুকুরে গরু-ছাগল নামতে দেয় না বা সাবান দিয়ে কাপড় কাঁচেনা। কারণ ঐ এলাকার টিউবওয়েলের পানি বেশ লবণাক্ত। তাই তারা টিউবওয়েলের পানি পান না করে রিজার্ভ পুকুরের পানি পান করে। কিন্তু ঐ পুকুরের পানি নিরাপদ নয়। তাই ১ কলস (১৬ সের)

পানিতে ১ চিমটি ফিটকিরি ৪-৬ ঘন্টা রেখে পান করার পরামর্শ দেয়া শুরু হয়। এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল শুধুমাত্র বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার জন্য।

লবনাক্ত পানির স্যালাইন

বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলের অনেক এলাকার পানি অত্যধিক লবণাক্ত। পানি অত্যধিক লবণাক্ত হওয়ার জন্য স্যালাইনে লবণের পরিমান বেড়ে যায়ঃ তখন এক দ্বন্দ দেখা দেয় যে এ সকল অঞ্চলে শিখানোর সময় লবণের পরিমান কম বলতে হবে নাকি এক চিমটিই বলতে হবে। বহু আলাপ আলোচনা ও বিশেষজ্ঞদের মতামত পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত হয় যে ঐ সব অঞ্চলে লবণ যথানিয়মে এক চিমটিই শিখাতে হবে। কারণ ঐ সব এলাকার লোকজন ঐ লবনাক্ত পানি পান করে অভ্যস্থ। ফলে ঐখানকার স্যালাইনে একটু লবণের পরিমাণ বেশী হলেও কোন ক্ষতি হবে না।

ডায়রিয়া সম্পর্কে জনগণের ধারণা ও তার স্থানীয় নাম ব্যবহার

রিসার্চের মোশতাক চাইয়ের ডক্টরেট ডিগ্রীর থিসিস লেখার সময় উনি মাঠ পর্যায়ে সার্ভে ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ডায়রিয়া সম্পর্কে জনগণের ধারণা জানার চেষ্টা করেন। উনার সার্ভে ও পর্যবেক্ষণে যা ধরা পড়ে তা হল জনগন ডায়রিয়াকে চারভাগে ভাগ করে। তা হল দুধহাগা, অজীর্ণ, আমাশয় এবং ডায়রিয়া বা কলেরা। যেহেতু শেখানোর সময় শুধুমাত্র ডায়রিয়ার কথা বলা হয় তাই তারা দুধহাগা, অজীর্ণ ও আমাশয়ে লবণ-গুড় স্যালাইন ব্যবহার করে না। এর পর থেকে শেখানোর বার্তাতে দুধহাগা, অজীর্ণ এবং আমাশয়ও যোগ করা হয় (সংযোজনী-২.৪)।

এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় ডায়রিয়ার বিভিন্ন নাম ব্যবহার করে থাকে। যেমন ঘাটে যাওয়া, পাতলা পায়খানা, বাম্বা, কলেরা ইত্যাদি। যেহেতু শেখানোর সময় শুধুমাত্র ডায়রিয়ার কথা বলা হত। তাই, ঘাটে যাওয়াতে তারা আর ব্যবহার করত না। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় যে কোন একটি উপজেলায় গিয়ে প্রথমেই ডায়রিয়ার স্থানীয় নাম খুঁজে বের করতে হবে এবং শেখানোর সময় তাদের প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

চাউলের গুড়ির স্যালাইনের পরীক্ষামূলক প্রকল্প

১৯৮৬ সালের শেষের দিকে যখন বৃহত্তর নোয়াখালী জেলাতে ওটেপের কাজ চলছিল তখন আইসিডিডিআরবি'র ডাঃ মজিদ মোল্লা আমাদের কাছে এক প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবটি হল চাউলের গুড়ার সেলাইনের কমিউনিটি পর্যায়ে সম্প্রসারণ কাজ। উনাকে ব্র্যাকের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের নিকট এ ব্যাপারে এক সেমিনার দিতে বলা হয়। উনার সেমিনারে বুঝা গেল যে চাউল-গুড়ির সেলাইন লবন-গুড় সেলাইন অপেক্ষা অনেক দিক থেকে উত্তম। ক্লিনিকে ডায়রিয়া রোগী চিকিৎসার জন্য লবন-গুড় সেলাইন ব্যবহার করার চেয়ে চাউল-গুড়ার সেলাইন ব্যবহারে ভাল ফল দেয়। এবং ক্লিনিকে রোগী চিকিৎসায় তা প্রমাণিত। মজিদ মোল্লা সাহেব সেমিনারের পর আমাদের আইসিডিডিআর,বির ক্লিনিকে নিয়ে যান এবং চাউল গুড়ার সেলাইন দিয়ে রোগী চিকিৎসা

দেখান। এরপর উনার বক্তব্য ছিল চাউল গুড়োর সেলাইনের সম্প্রসারণের কাজ ব্র্যাকের মত একটি বৃহৎ ও সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থার হাতে নেওয়া উচিত। উনার পরামর্শমত ১৯৮৫ সালের শেষের দিকে লক্ষ্মীপুর জেলাতে চাউল-গুড়োর সেলাইনের পরীক্ষামূলক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এই পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিলেন ফজলুল করিম। সেলাইন বানানোর জন্য দরকার হত একমুঠ চাউলকে প্রথমে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে পাটায় গুড়া করে আধাসেরের চেয়ে কিছু বেশী পানিতে মিশিয়ে চুলায় ফুটিয়ে একটু ঘন হলে নামাতে হবে। পরে তিন আঙ্গুলের প্রথম দাগের সমান একটি চিমটি লবন মিশিয়ে নিতে হয়। সম্প্রসারণের জন্য পরীক্ষামূলক প্রকল্পের ফলাফল সন্তোষজনক ছিল না। কারণ সাধারণতঃ চাউলের গুড়া কারো ঘরে থাকে না। চাউলের গুড়া করা একটি কষ্টের ব্যাপার। তাছাড়া ফুটানোর সময় কম বা বেশী হওয়ার জন্য লবণের পরিমাণের হেরফের হতে পারে। এ ছাড়াও চাউল গুড়া করার জন্য সবার ঘরে শিল-পাটা থাকে না। ফলে চাউল গুড়ো করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যপার হয়ে দাড়ায়। তাই সিদ্ধান্ত হয় যে সম্প্রসারণের জন্য আরো পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে এবং তা তৃতীয় ধাপের যে কোন একটি জেলাতে করে দেখতে হবে। এবং এ পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়া গেলে তৃতীয় ধাপের জেলাগুলোতে চাউল-গুড়ির সেলাইনের উপর শিক্ষাদান করতে হবে। গবেষনা ও মূল্যায়ন বিভাগ জয়পুর হাটের একটি ইউনিয়নে এটা কমিউনিটি পর্যায়ে দীর্ঘদিন গবেষনা করে আশানুরূপ ফল পায়নি।

দলগতভাবে শেখানো

দ্বিতীয় ধাপের শেষের দিকে যখন দেখা গেল যে বাংলাদেশের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ বাড়ীতে ডায়রিয়ার বার্তাগুলো শেখানো হয়ে গেছে তখন চিন্তা করা হয় যে এখন আর একজন একজন করে শেখানোর কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা! কারণ লোকজন ঐ সময় ডায়রিয়া সম্পর্কে অনেক সচেতন এবং কোন-না-কোনভাবে ডায়রিয়া সম্পর্কে জেনেছে। এরমধ্যে দাতা সংস্থাগুলো রেডিও ও টেলিভিশনে লবণ-গুড় স্যালাইনের প্রচারণার ফলাফলের উপর একটা মূল্যায়ন করে। এবং ঐ মূল্যায়নে দেখা যায় যে সকল এলাকায় তখনও ব্র্যাকের কর্মীরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে শিক্ষা প্রদান করেনি সে সকল এলাকার শতকরা ৭৮ ভাগ লোকজন লবণগুড় স্যালাইন সম্পর্কে জানে। তবে হয়ত সঠিকভাবে তারা লবণ-গুড় স্যালাইন তৈরী করতে পারে না। জনগণের ডায়রিয়া সম্পর্কে সচেতনতার ঐ পর্যায়ে চিন্তা করা হয় যে একজন একজন করে না শিখিয়ে ৫ জনের এক একটি দলকে নিয়ে শিখালে কেমন হয়! এই চিন্তাভাবনার আলোকে তখন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলার ২টি ইউনিয়নে এ ব্যাপারে পরীক্ষা চালিয়ে দেখতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে দলগতভাবে মায়েদের শেখানো হয় এবং ফেব্রুয়ারী মাসে তা মনিটরিং করে দেখা যায় যে মায়েদের বার্তাগুলো মনে রাখার হার ঐ একজন একজন করে শেখানোর মতই। বরং এই পদ্ধতিতে শেখানোর জন্য খরচ কম, শেখানোর সময় মায়েরা একে অপরকে সাহায্য করে এবং কেউ ভুলে গেলে আরেকজন তাকে বলে দেয়। এই ফলাফল মূল্যায়নের পর এবং তা সন্তোষজনক হওয়ার ফলে ১৯৮৬ সালের মার্চ মাস থেকে ওটেপের সকল জায়গাতেই দলগতভাবে মায়েদের শিক্ষা দেয়া শুরু হয়।

ওটেপের দ্বিতীয় ধাপে আরো বিশেষ দুটি বিষয়ের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল। বিষয় দুটি হল টিকাদান কর্মসূচী এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার সকল উপাদান সহকারে স্বাস্থ্য কর্মসূচী ব্র্যাক কর্তৃক বাস্তবায়ন করা সম্ভব কিনা! আর এ সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার দায়িত্বে ছিলেন ফজলুল করিম। তিনি এ- সময় ওটেপের এলাকা ব্যবস্থাপক ছিলেন।

টিকাদান কর্মসূচীর উপর পরীক্ষামূলক প্রকল্প (অক্টোবর '৮৫-ফেব্রুয়ারী '৮৬)

এই পরীক্ষামূলক প্রকল্পের উপর কাজ শুরু হয় ১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসে। নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলার ২টি ইউনিয়নে লবণ-গুড় স্যালাইনের শিক্ষাদানের পাশাপাশি শিশু ও মহিলাদের টিকা দেয়া হয়। মহিলাদের টিকা দেয়ার অভিজ্ঞতা ব্র্যাক এর পূর্বেই অর্জন করেছিল। কারণ, ১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে CRP ইউনিয়নগুলোতে ১৫--৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের টিটি ইনজেকশন ব্র্যাক কর্তৃক দেয়া হয়েছিল। এ প্রকল্পে আরো যে সকল কাজ এর পাশাপাশি করা হয়েছিল তা'হল, দাই প্রশিক্ষণ, কলস্ট্রাম ও বাড়তি খাবারের ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করা, গ্রাম স্বাস্থ্য কমিটি গঠন ইত্যাদি। টিকাদান কর্মসূচীর কারিগরী দিক যেমন কোল্ড চেইন বজায় রাখা, বীজাণুমুক্তকরণ, সঠিকভাবে ইনজেকশন দেয়া এ সবের জন্য ব্র্যাক ইপিআই থেকে কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। এবং ১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে ব্র্যাক কর্মীদের এই আত্মবিশ্বাস জন্মেছিল যে টিকাদান কর্মসূচীর সকল কারিগরী দিক বজায় রেখে এ কর্মসূচী চালানো ব্র্যাকের

পক্ষে সম্ভব। তবে শিশুদের জন্য সকল টিকার ডোজ ব্র্যাকের পক্ষে দেয়া সম্ভব কিনা তা দেখা হয় সোনারগাও পরীক্ষামূলক প্রকল্পে। ভ্যাকসিন সরবরাহ করত ইপিআই। ভ্যাকসিন ঢাকা থেকে নিয়ে গিয়ে সোনারগাঁ উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রেফ্রিজারেটরে রাখা হত। তারপর সেখান থেকে ভ্যাকসিন কেরিয়ারে করে নিয়ে যাওয়া হত গ্রামে। এ পরীক্ষামূলক প্রকল্প চলে প্রায় ৬ মাস। এবং দেখা গেল যে ব্র্যাক সফলতার সাথে শিশু ও মহিলাদের টিকা প্রদানে সক্ষম।

এই পরীক্ষামূলক প্রকল্প শেষ হওয়ার পর ব্র্যাকের কর্মীদের মধ্যে জোর দাবী ওঠে যে শিশু মৃত্যু রোধের জন্য ORT-এর পাশাপাশি ব্র্যাকের টিকাদান কর্মসূচী হাতে নেয়া উচিত। এবং ORT-এর মত সারা বাংলাদেশে শিশু ও মহিলাদের টিকা দেয়ার সার্বিক দায়িত্ব ব্র্যাকের নেয়া উচিত। আরো দাবী ওঠে যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার সকল উপাদান নিয়ে ব্র্যাকের আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিত। এবং দেখা উচিত কি ধরনের কাজ করলে জনগণ তা ধরে রাখতে পারবে এবং স্বাস্থ্য সুবিধাদি পাবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে পরবর্তীতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপর পাইলট প্রকল্প হাতে নেয়া হয়।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপর পাইলট প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬--সেপ্টেম্বর ১৯৮৬)

এ পাইলট প্রকল্প নেয়া হয় ২টি উপজেলায়। উপজেলাগুলো হচ্ছে পাবনা জেলার সাঁথিয়া এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া। ৮টি উপাদানের উপর এই দুই উপজেলায় কাজ হয়। উপাদানগুলো হচ্ছেঃ ও,আর,টি শিক্ষা, টিকাদান, ভিটামিন এ ক্যাপসুল বিতরণ, পুষ্টি শিক্ষা, ধাত্রী প্রশিক্ষণ, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, পরিবার পরিকল্পনা ও সাধারণ চিকিৎসা। এখানে সবচাইতে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তাহল, প্রতিটি গ্রামে স্বাস্থ্য সংগঠন গড়ে তোলা এবং সংগঠনগুলোকে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন করে তোলা যাতে তারাই পরবর্তীতে জনগণের স্বাস্থ্য সুবিধাদি নিশ্চিত করতে পারে। সংগঠন গড়া এবং তাদেরকে অধিকতর যোগ্য করে তোলা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এদিকে ওটেপের ২য় ধাপের কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে। তাই সিদ্ধান্ত হয় যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার কোন মডেল তৈরী করতে চাইলে ওটেপের ৩য় ধাপে আরো বড় আকারে অর্থাৎ বর্তমানের দুটি উপজেলাসহ আরো উপজেলায় পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রকল্প হাতে নেয়া উচিত। এবং একটি উপজেলায় কমপক্ষে ২ বছর কাজ করা উচিত।

শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচী (অক্টোবর ১৯৮৬ -- ডিসেম্বর ১৯৯০)

শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচীকে আসলে ওটেপের ৩য় ধাপ বলা চলে। কারণ ওটেপের অসমাপ্ত কাজটি সমাপ্ত করার দায়িত্ব বর্তায় শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচীর উপর। ওটেপের ২য় ধাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ বাড়ীতে ORT-এর বার্তা পৌঁছে দেয়া হয়েছিল। বাকী ছিল আরো এক তৃতীয়াংশ। তখন ব্র্যাকের নৈতিক দায়িত্ব হয় এই বাকী এক তৃতীয়াংশ বাড়ীতে ORT-এর বার্তা পৌঁছে দেয়ার। একদিকে যেমন দীর্ঘদিন স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কাজ করার ফলে ব্র্যাকের কিছুটা যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্যতা কিছুটা বাড়ে। অন্যদিকে পরীক্ষামূলক প্রকল্পগুলোর উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফল ব্র্যাককে অনুপ্রাণিত করে এই সিদ্ধান্ত নিতে যে বাকী এক তৃতীয়াংশ বাড়ীতে শুধুমাত্র ডায়রিয়া শিক্ষা দেয়া হবে না, পাশাপাশি শিশুমৃত্যু রোধ করা যায় এমন কিছু উপাদান ও মহিলা স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য কাজ করা হবে। তাই এর নাম পাল্টে ওটেপের বদলে রাখা হয় শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচী।

এ কর্মসূচীর কাজ হয় বৃহত্তর ৭টি জেলায়। বেশীরভাগ জেলাগুলো রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত। জেলাগুলো হল : পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার (সংযোজনী-১)। এ জেলাগুলোর কাজ হয় ১৯৮৬ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত।

এ কর্মসূচীর অধীনে প্রকল্প ছিল দুটি। প্রথমটি ছিল OIA। এর অধীনে ছিল ডায়রিয়া শিক্ষা, টিকাদান ও ভিটামিন এ ক্যাপসুল বিতরণ। এ প্রকল্পটি ছিল আকারে বড়। দ্বিতীয় প্রকল্পটি ছিল প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা। এর অধীনে ছিল আটটি উপাদান। উপাদানগুলো হচ্ছেঃ ডায়রিয়া শিক্ষা, টিকাদান, ভিটামিন এ ক্যাপসুল বিতরণ, পুষ্টি শিক্ষা, ধাত্রী প্রশিক্ষণ, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিস্কাশন, পরিবার পরিকল্পনা ও সাধারণ চিকিৎসা। এটা নেয়া হয় পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে এবং ৬টি উপজেলায়। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপজেলাগুলো হচ্ছে : পাবনার সাঁথিয়া, মানিকগঞ্জের ঘিওর, সাটুরিয়া ও মানিকগঞ্জ এবং রংপুর জেলার রংপুর ও তারাগঞ্জ।

OIA প্রকল্পের ডায়রিয়া শিক্ষা ওটেপের দ্বিতীয় ধাপের মত ৪-৫ জন মাকে একত্র করে দলগতভাবে শিক্ষা দেয়া হয়। এবং টিকাদান ও ভিটামিন এ ক্যাপসুল (ভ্যাক) বিতরণে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করা হয়। কারণ ব্র্যাক ইতোমধ্যে উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে এমন কোন কাজ করা উচিত না যা ব্র্যাক এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর জনগণ তা ধরে রাখতে পারবে না। তাহলে ব্র্যাক যতদিন থাকবে জনগণ শুধুমাত্র ততদিন স্বাস্থ্য সুবিধাদি পাবে। ব্র্যাক চলে যাওয়ার সাথে সাথে জনগণ সেসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। অপর পক্ষে ডায়রিয়া শিক্ষা কার্যক্রম হতে টিকাদান বা ভিটামিন এ ক্যাপসুল বিতরণ একটু ভিন্নতর। কারণ ডায়রিয়ার শিক্ষাটা থাকলে স্যালাইন বানানোর অন্যান্য উপকরণ যেমন পানি, গুড় ও লবণ ঘরেই পাওয়া যায়। এরজন্য অন্য কারো উপর নির্ভর করতে হয় না। তাই ব্র্যাক না থাকলেও যদি শিক্ষাটা থাকে তাহলে জনগণ তা ব্যবহার করতে পারবে এবং উপকার পাবে। কিন্তু টিকাদান ও ভিটামিন এ ক্যাপসুলের সরবরাহের জন্য সরকারের উপর নির্ভরশীল। ব্র্যাক হয়ত ২-৩ বছর সরকারের কাছ থেকে সরবরাহ নিয়ে এ কাজটি সরাসরি করতে পারে। কিন্তু তারপর ব্র্যাক যখনি চলে যাবে জনগণ তখন সুবিধা থেকে

বঞ্চিত হবে। ফলে সিদ্ধান্ত হয় যে, যে সকল কার্যক্রম কোন না কোনভাবে সরকারের উপর নির্ভরশীল সেসব ক্ষেত্রে ব্র্যাক সরাসরি কোন কাজ করবে না। এক্ষেত্রে দু ধরনের কাজ ব্র্যাক করবে। প্রথম কাজ হবে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি। যেমন, ঐ সব স্বাস্থ্য সুবিধাদি তারা কোথায় পাবে, সরকারি কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তার কাছ থেকে সুবিধাদি পাবে বা পেতে পারে ইত্যাদি। দ্বিতীয় কাজ হবে সরকারি কর্মচারী বা কর্মকর্তাদের সহযোগিতা প্রদান করা যাতে তারা সুবিধাদি জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে পারে। অর্থাৎ এককথায় বলতে গেলে স্বাস্থ্য সুবিধাদি জনগণের দ্বারপ্রান্তে যাতে পৌঁছায় সে জন্য একটা পদ্ধতি গড়ে তুলে সেই পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণ এবং সরকারি কর্মচারী বা কর্মকর্তাদের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করা। জনগণ এবং সরকারি কর্মচারীরা যদি সচেতন ও তৎপর হয় তাহলে পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবে।

এ সকল চিন্তাভাবনার আলোকে ব্র্যাকের OIA প্রকল্পের টিকাদান কার্যক্রমে ব্র্যাকের দায়িত্ব ছিল তারবিয়া শিক্ষার সাথে সাথে টিকা দিয়ে বাচ্চাদের মারাত্মক ছয়টি রোগের হাত থেকে বাঁচানো যায় এ শিক্ষা জনগণকে দেয়া এবং মহিলাদের টিটি নিতে উদ্বুদ্ধ করা। এ ছাড়া, ব্র্যাকের আর যা কাজ ছিল তাহল, জনমত তৈরী এবং টিকা নেয়ার জন্য যাতে জনগণ টিকাদান কেন্দ্রে যায় তা নিশ্চিত করা (সংযোজনী-৭)। অপরপক্ষে, সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তারা যাতে নির্ধারিত দিনে টিকাদান কেন্দ্রে যায় সেজন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা। একইভাবে ভিটামিন এ ক্যাপসুল বিতরণে ব্র্যাকের ভূমিকা ছিল জনগণকে সচেতন এবং সরকারী কর্মচারীদের ক্রমাগত সহযোগিতা করা ও উৎসাহ যোগানো। যেহেতু লবন-গুড় স্যালাইনের পাশাপাশি অন্যান্য কাজও হাতে নেয়া হয় এবং কাজগুলোকে মনিটরিং করা খুব সহজ ছিল না। অপর পক্ষে মহিলা কর্মীদের কাছ থেকে ক্রমাগত দাবী আসতে থাকে যে তাদের বেতন মাসিক ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে দেওয়া উচিত। তাই শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচীতে মহিলা কর্মীদের বেতন মাসিক ভিত্তিতে দেয়া হয়।

শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচীতে আরো যে সকল পরীক্ষামূলক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল তাহল প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ফেসিলিটেশন এবং পরিবার পরিকল্পনা।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ফেসিলিটেশন

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল ইপিআই ও ভ্যাক বিতরণ ছাড়া সরকারের স্বাস্থ্য কর্মসূচীর আর কোন কোন কার্যক্রমকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করলে তা সক্রিয় করা সম্ভব এবং জনগণ সরকারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে সেবা পাবে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ২ সদস্য বিশিষ্ট একটি করে টিম ৬টি উপজেলায় পাঠানো হয়। তারা উপজেলাগুলোয় ১ মাসের অধিককাল থাকে। উপজেলায় থাকাকালীন অবস্থায় তারা সরকারি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী, স্থানীয় লোকজন ও অন্যান্য সংস্থার কর্মীদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে। তথ্যগুলো পরবর্তীতে বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলোকে আরো জোরদার করা উচিত।

১) ই পি আই।
২) স্যাটেলাইট ক্লিনিক।
৩) ধাত্রী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ।
৪) নিরাপদ পানি ও ল্যাট্রিন সরবরাহ।
৫) ডায়াক বিতরণ।
৬) পরিবার পরিকল্পনা।

পরিবার পরিকল্পনা

পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা আরো বাড়ানো যায় কিনা সে ব্যাপারে পরীক্ষামূলক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। এটাও ছিল ফেসিলিটেশন কর্মসূচীর অধীনে। অর্থাৎ কাজ ছিল জনগণকে উদ্বুদ্ধ এবং সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সরকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মচারী বা কর্মকর্তার সাথে জনগণের যোগাযোগ স্থাপন করা। এ কাজ হাতে নেয়া হয় নীলফামারীর সৈয়দপুরে এবং কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলায়। প্রতিটি উপজেলা থেকে ২টি করে মোট ৪টি ইউনিয়নে কাজ করা হয়। প্রতি উপজেলায় ৯ সদস্যবিশিষ্ট ব্র্যাকের একটি করে টিম কাজ করে। টিমের সদস্যদের মধ্যে ৬ জন ছিল মহিলা কর্মী ও ৩ জন পুরুষ কর্মী।

এ ছাড়া, মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলায় পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে ডিপো হোল্ডার তৈরী করা হয়। সাটুরিয়া উপজেলায় প্রতিটি গ্রামে ১০০ খানার জন্য ১ জন করে স্থানীয় ডিপো হোল্ডার নির্বাচন করা হয়। সরকারের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী, তার বিভিন্ন পদ্ধতি ও বিতরণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের ৪ দিনের এক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণের আয়োজন করে ব্র্যাক এবং প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করে পরিবার পরিকল্পনার কর্মীরা। ডিপো হোল্ডাররা FWA ও FWV-দের তত্ত্বাবধানে কাজ করত এবং তাদের কাছ থেকে বড়ি ও কনডম সংগ্রহ করত।

ওটেপ কার্যক্রমের ফলাফল ঃ

ওটেপের মাধ্যমে বাংলাদেশে বৃহত্তর ২১টি জেলার মধ্যে ২০টি জেলায় ডায়রিয়ার উপর ১,১৭,৯২,৬৫৪ পরিবারে (সংযোজনী-১৮) শিক্ষা দেয়া হয়। যে জেলাটি ওটেপ কার্যক্রম থেকে বাদ পড়ে তাহল পার্বত্য চট্টগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের যাতায়াত ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম থেকে জেলাটিকে বাদ দেয়া হয়। এ শিক্ষা ৪২৩টি উপজেলার ৪২৫৪টি ইউনিয়নের ৭৫৯৯২টি গ্রামে পৌঁছে দেয়া হয়। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মোট খানার সংখ্যা প্রায় ১,২০,০০,০০০। সে হিসেবে ওটেপ প্রায় ৯৮% পরিবারে ডায়রিয়ার শিক্ষা পৌঁছে দিয়েছে। মোট ৪,৪৭,৮৫৭টি মাকে মনিটর করা হয় যা মোট শিক্ষাপ্রাপ্ত মায়ের ৩.৮%। এই শিক্ষা ৩৬,৮৪৪টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২৯,১৩,৫৭৮ জন ছাত্রছাত্রীকে দেয়া হয়েছে। যাদের কাজ তাদের পরিবার ও গ্রামে গ্রামে এর প্রচারণা চালানো। এই কর্মসূচীর ব্যাপক প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট, পোষ্টার ও ফোল্ডার বিতরণ করা হয় এবং রেডিও ও টেলিভিশনে স্পট প্রচার করা হয়। সারা কর্মসূচীতে ২৩,২৯,০০০টি স্ক্রিপ্ট, ৭,১৩,০০০টি পোষ্টার ও ৩,৩৮,০০০টি ফোল্ডার জনগণের মাঝে বিতরণ করা হয়। লবণ-গুড় সেলাইনের মাধ্যমে প্রায় ৪,২৭,৬০৬টি ডায়রিয়া রোগীর যত্ন নেয়া হয় এবং চিকিৎসা করা হয়।

ওটেপের অবদান

ক. জাতীয় পর্যায়ে

১. দেশের শতকরা ৯৫ জনের বেশী লোক ডায়রিয়া সম্পর্কে সচেতন।

ব্র্যাকের ওটেপ কর্মসূচীর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৭৮ বা ১৯৭৯ সালের দিকে খুব কম সংখ্যক লোকেরই ডায়রিয়া চিকিৎসা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সকলেই ডায়রিয়া এবং তার ব্যবস্থাপনায় লবণ-গুড় স্যালাইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে জ্ঞাত। এটা সম্ভব হয়েছে ওটেপ কর্মসূচীতে প্রতি বাড়ীতে কমপক্ষে একজন মহিলাকে ডায়রিয়া সম্পর্কে শিক্ষাদানের জন্য।

২. সকলেই ডায়রিয়ার সহজ চিকিৎসা সম্পর্কে জানে।

ওটেপের শুরুর দিকে কিছুসংখ্যক লোক বিশেষ করে কেবলমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায় ডায়রিয়া চিকিৎসায় মুখে খাওয়ার স্যালাইন সম্পর্কে অবগত ছিল। এবং এই মুখে খাওয়ার স্যালাইন হল প্যাকেট স্যালাইন। কিন্তু ওটেপ কর্মসূচী পরিচালনার ফলে বাংলাদেশের সবাই ডায়রিয়া চিকিৎসায় ঘরে তৈরী মুখে খাওয়ার স্যালাইনের কথা জানে। বাংলাদেশের সবাই লবণ-গুড় স্যালাইন কিভাবে বানাতে হয় এবং এটা যে ডায়রিয়া চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয় তা সবাই অবগত।

৩. অনেকেই ডায়রিয়া হলে লবণ-গুড় ও প্যাকেট স্যালাইন ব্যবহার করে।

ওটেপ কর্মসূচীর পূর্বে বা সূচনাকালে অনেকেই প্যাকেট স্যালাইন সম্পর্কে জানত কিন্তু ব্যবহার ছিল খুবই নগণ্য। ওটেপ কর্মসূচীর ফলে প্যাকেট স্যালাইনের ব্যবহার বাড়ে এবং লবণ-গুড় স্যালাইন সম্পর্কে জনগণের অবগতি ঘটে এবং জনগণ লবণ-গুড় স্যালাইনের ব্যবহারও শুরু করে।

৪. শিশুর মৃত্যুর হার কমানো।

ওটেপ কর্মসূচীর ফলে বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার কিছুটা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তবে শতকরা কতভাগ শুধুমাত্র এই কর্মসূচীর জন্য কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে তা বলা মুশকিল।

৫. ডায়রিয়ার উপর প্রচারিত বিভিন্ন বার্তায় সাদৃশ্য আনা হয়েছে।

ওটেপের প্রথমদিকে মুখে খাওয়ার স্যালাইন বানানোর জন্য যদিও ব্র্যাক আধাসের পানির কথা বলত কিন্তু অন্যান্য সংস্থা একসের পানির কথা বলত। তৈরী স্যালাইন ব্যবহারের সময়সীমা নিয়েও পার্থক্য ছিল। একইভাবে রোগ প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন সংস্থা প্রকাশিত বার্তার ভিতরে ভিন্নতা ছিল। ব্র্যাকের প্রচেষ্টায় ওটেপের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশে ডায়রিয়ার উপর প্রচারিত বার্তাগুলোতে সাদৃশ্য বিধান করা হয়। যেমন এখন স্যালাইন বানানোর জন্য সবাই আধাসের পানির কথা বলে। লবণ-গুড় স্যালাইন রাখার ব্যাপারে সবাই ৬ ঘন্টা বলে।

৬. মহিলা কর্মী সম্পর্কে জনগণের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন।

ওটেপ সূচনার প্রথমদিকে অর্থাৎ ১৯৮০ সালে গ্রামে মহিলা কর্মী দেখলেই জনগণ ধরে নিত যে সে পরিবার পরিকল্পনার কর্মী। কারণ তখন শুধুমাত্র পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মহিলা কর্মীরাই গ্রামে গ্রামে ঘুরে পরিবার পরিকল্পনার সেবা জনগণের নিকট পৌঁছে দিত। কিন্তু ওটেপের মহিলা কর্মীরা বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামে ঘুরে ডায়রিয়া বিষয়ে শিক্ষা দেয়ার ফলে জনগণের পূর্বের ধারণা পাল্টে গেছে। এখন জনগণ জানে যে মহিলা কর্মী মানেই পরিবার পরিকল্পনার কর্মী নয়।

৭. মহিলাদের চাকুরী সম্পর্কে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন।

সাধারণতঃ আমাদের দেশে মহিলারা অফিসে বসে চাকুরী করে। কিন্তু ওটেপের মহিলা কর্মীরা অফিসের বাইরে প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুরে ঘুরে কাজ করেছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে আমাদের দেশে মহিলারা অফিসের চার দেয়ালের বাইরে, গ্রাম্য পরিবেশে এবং Mobile কাজও তারা করতে সক্ষম।

৮. সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজ সম্পর্কে জনগণের ধারণা পাল্টানো।

আমাদের দেশে জনগণের ধারণা যে, কর্মকর্তারা অফিসে বসে কাজ করবে এবং জনগণের কোন সমস্যা হলে জনগণ সে সমস্যা নিয়ে কর্মকর্তাদের কাছে যাবে। কিন্তু ওটেপের উচ্চশিক্ষিত পুরুষ কর্মীদের গ্রামে গ্রামে ও বাড়ি বাড়ি ঘোরার ফলে জনগণের মনে এ ধারণা জন্মেছে যে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরও জনগণের সেবা প্রদানের জন্য ব্র্যাক কর্মীদের মত গ্রামে আসা উচিত। সেবা পাওয়ার জন্য যেমন জনগণের দায়িত্ব আছে অফিসে যাবার একইভাবে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব সেবা প্রদানের জন্য গ্রামে যাওয়া।

৯. ছাত্র ও অভিভাবকদের মধ্যে ধারণা পাল্টানো যে শিক্ষিত হওয়া শুধুমাত্র অফিসে বসে কাজ করার জন্য নয়।

ওটেপের সব উচ্চশিক্ষিত কর্মীদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে কাজ করা স্কুলের ছাত্র ও তাদের অভিভাবকরা দেখেছেন। কারণ কর্মীরা প্রতিটি স্কুলে ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে সভা করে লবণ-গুড় স্যালাইনের শিক্ষা দিয়েছে। এছাড়া তারা প্রতিটি গ্রাম ও পাড়ায় যখন ঘুরেছে তখন তারা ছাত্রদের সাহায্য নিয়েছে। এতে করে অভিভাবক ও ছাত্রদের পাশ করার পর শহরে একটা ভাল অফিসে চাকুরী করার মানসিকতার কিছুটা পরিবর্তন আসবে। ফলে পরবর্তীতে সহজে এদের গ্রামমুখী করা যাবে।

ঘ. ব্র্যাক পর্যায়ে

১. **ব্র্যাক দেশে এবং বিদেশে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেছে।**

ওটেপের শুরুর দিকে ব্র্যাক বললে লোকে বিভিন্নমুখী প্রশ্ন করত ব্র্যাক সম্পর্কে। ব্র্যাক সম্পর্কে বলতেই লাগত প্রায় ১৫ মিনিট। কারণ খুব কমসংখ্যক লোকই তখন ব্র্যাকের নাম জানত। কিন্তু ওটেপ পরিচালনার ফলে এখন একনামে সবাই ব্র্যাককে চেনে। ব্র্যাক বললে বোঝে যে এটি একটি বেসরকারী সংস্থা এবং এরা ডায়রিয়ার উপর কাজ করে। কারণ প্রতিটি গ্রামে ওটেপের কর্মীরা গিয়েছে এবং ব্র্যাক সম্পর্কে বলেছে। তাছাড়া রেডিও, টিভি এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলোতে ডায়রিয়ার উপর বার্তা দেয়া হয়েছে এবং সেখানে ব্র্যাক কর্তৃক প্রচারিত তা বলা হয়েছে। ফলে যেটা হয়েছে যে ব্র্যাক ঠিকই ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে কিন্তু ব্র্যাকের সামগ্রিক কর্মকান্ড গুরুত্ব না পেয়ে শুধুমাত্র ডায়রিয়া দিকটা গুরুত্ব পেয়েছে। একইভাবে বিদেশেও সবাই ব্র্যাককে চেনে এবং জানে ব্র্যাক বাংলাদেশে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এবং তারা আরো জানে যে ব্র্যাক এমন একটি বেসরকারী সংস্থা যারা জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখতে সক্ষম।

২. **ব্র্যাকের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।**

ওটেপ কর্মসূচীতে প্রায় ১২০০-১৩০০ পুরুষ ও মহিলা কর্মী কাজ করেছে। শাল্লা প্রকল্প থেকে ৪-৫ জন পুরুষ কর্মী ও ২০ জন মহিলা কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে ওটেপের সূচনা। এবং প্রথম ধাপের শেষভাগে অর্থাৎ ১৯৮৩ সালের দিকে ওটেপে ব্র্যাক প্রায় ১২০০-১৩০০ দক্ষ কর্মী তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিল। এই কর্মী বাহিনী ব্র্যাকের জন্য এমন একটি সাংগঠনিক শক্তি যা যে কোন মুহূর্তে যে কোন জাতীয় কর্মসূচী গ্রহণে ব্র্যাক পারঙ্গম।

৩. **ব্র্যাকের গ্রহণযোগ্যতা সরকারের কাছে বৃদ্ধি পেয়েছে।**

ওটেপের প্রথমদিকে অর্থাৎ ১৯৮০-৮১ সালের দিকে সরকারের অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীরই ব্র্যাক সম্পর্কে ধারণা খুবই সীমিত ছিল। তাদেরকেও জনগণের মত ব্র্যাক সম্পর্কে প্রায় আধাঘন্টা বোঝাতে হত। ফলে ব্র্যাক কোন ধরনের সংস্থা এবং ব্র্যাকের যোগ্যতা কতটুকু সে সম্পর্কে অনেক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু ওটেপের মত একটি জাতীয় কর্মসূচী সফলভাবে পরিচালনার ফলে এবং টিকাদান কর্মসূচীতে সফলভাবে সরকারকে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে ব্র্যাক সরকারের কাছে এটা প্রতিষ্ঠিত করেছে যে ব্র্যাককে যে কোন দায়িত্ব দিলে ব্র্যাক তা সাফল্যের সাথে করতে সক্ষম। এরফলে পূর্বে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মনে ব্র্যাক সম্পর্কে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল তা অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছে এবং এখন সরকারের কাছে কোন প্রস্তাব রাখলে সরকার আগের মত আর সংশয় বা সন্দেহ প্রকাশ করে না বরং যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে।

৪. ব্র্যাকের চিন্তাধারার পরিবর্তন

ব্র্যাক প্রথমদিকে বিশ্বাস করত যে, যে কোন কাজই করা হোক না কেন তা সীমিত আকারে এবং ভালভাবে করা উচিত। তা না হলে কাজের গুণগত মান বজায় রাখা সম্ভব হবে না এবং ঐ কাজের ফলাফলও ভাল হবে না। কিন্তু ওটেপ পরিচালনার ফলে ঐ ধারণার পরিবর্তন আসে। ধারণা হয় যে দেশের কোন একটি দিকের পরিবর্তন আনতে চাইলে সীমিত আকারে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কাজ করে তা সম্ভব নয়। ফলে করতে হবে বড় আকারে এবং পারলে তা জাতীয় পর্যায়ে করা উচিত।

ব্র্যাকের প্রথমদিকে আরো ধারণা ছিল যে, যে কোন কাজই করা হোক না কেন তা ব্র্যাকের নিজের মত করে ব্র্যাকের কর্মীর দ্বারা করা উচিত। কিন্তু ওটেপ কর্মসূচীতে সরকারকে ইপিআই কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানের সময় ব্র্যাকের ধারণা পাল্টায়। তখন থেকে ব্র্যাক চিন্তা করে যে বেসরকারী সংস্থা হিসেবে ব্র্যাকের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন অর্থ, একই জায়গায় দীর্ঘদিন যাবত অবস্থান ও কাজ করা। তাই ব্র্যাকের উচিত সরকারী সেবা সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। অপরপক্ষে, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যাতে জনগণকে সেবা প্রদানের জন্য তৎপর হয় সেজন্য তাদের সাথে কাজ এবং সহযোগিতা প্রদান করা। যাতে করে জনগণের চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য কমিয়ে আনা যায়। ওটেপ পরিচালনার ফলে ব্র্যাকের ধারণা হয় যে শুধুমাত্র স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ব্র্যাক সচেষ্ট থাকলে জাতীয় পর্যায়ে বড় আকারের অবদান রাখা সম্ভব হবে না। তাই স্থানীয় সমস্যা সমাধানের মত কার্যক্রমের পাশাপাশি জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য জাতীয় কার্যক্রমও হাতে নেয়া উচিত। তাহলে ব্র্যাক বাংলাদেশের জনগণের উন্নয়নের জন্য কিছু একটা অবদান রেখে যেতে পারবে।

৫. ব্র্যাকের এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, যে কোন জাতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন ব্র্যাকের পক্ষে সম্ভব।

ওটেপ শুরুর পূর্বে ব্র্যাকের যে সাংগঠনিক শক্তি ছিল তাতে জাতীয় কার্যক্রম হাতে নেয়ার চিন্তা-ভাবনা করা খুব কঠিন ছিল এবং বেশ চিন্তা করতে হত। কিন্তু বর্তমানে যে সাংগঠনিক শক্তি ব্র্যাক অর্জন করেছে তাতে যে কোন দুর্যোগময় মুহূর্তে বা জাতীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে ব্র্যাক কুণ্ঠিত হয় না। বর্তমানে জাতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার মত যথেষ্ট সাংগঠনিক শক্তি ব্র্যাক ইতোমধ্যেই অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)

ডায়রিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচী

"ডায়রিয়া ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে মনে রাখার দশটি পয়েন্ট"

১। ডায়রিয়া বা কলেরা হলে পাতলা পায়খানা হয়। পাতলা পায়খানার সাথে কখনো কখনো বমি, অরুচি, পেটফাঁপা, হাতে পায়ে খিঁচুনী লাগা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। পাতলা পায়খানার সাথে পানি ও লবণ বের হয়ে যায়। এবং এগুলোর অভাবে ঐ সমস্ত লক্ষণ দেখা দেয়। পেটের অসুখ এবং দুধ হাগাতেও পাতলা পায়খানা হয় এবং শরীর থেকে পানি ও লবণ বের হয়ে যায়। তাই পেটের অসুখ, দুধ হাগা, কলেরা ও ডায়রিয়া আসলে একই ধরনের রোগ।

২। দূষিত পানি, পচা, বাসি বা মাছি-বসা খাবার ও শিশুদের বেলায় নোংরা খাবার খাওয়া, ধূলাবালি, অপরিস্কার স্তন মুখে দেয়া ইত্যাদি থেকে এ রোগ হয়। ডায়রিয়া রোগীর মলমূত্র নদী, হাওর বা পুকুরের পানিতে ধুলে ঐ পানিতে এ রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। যে কেউ ঐ পানি পান করলে তার ডায়রিয়া হয়। রোগীর পায়খানা বা মলমূত্রের উপর মাছি বসলে তার পায়ে ও ডানায় এ রোগের জীবাণু লেগে যায়। পরে ঐ মাছি যখন আমাদের খাবারে বসে তখন ডায়রিয়ার জীবাণু খাবারে মিশে যায়। ঐ খাবার খেলেও ডায়রিয়া হয়।

এ রোগের হাত থেকে বাঁচতে হলে আমাদের টিউবওয়েলের পানি পান করতে হবে। টিউবওয়েলের পানি না পেলে পানি ফুটিয়ে পান করতে হবে। পচা, বাসি খাবার খাওয়া বন্ধ করতে হবে। খাবার জিনিস সব সময় ঢেকে রাখতে হবে। খাওয়ার আগে হাত-মুখ পরিস্কার করে ধুয়ে নিতে হবে।

মনে রাখবেন, মায়ের দুধে কোন দোষ নেই। অপরিস্কার স্তন মুখে দেয়ার ফলেই এ রোগ হয়। তাই বাচ্চাদের বেলায় স্তন পরিস্কার করে ধুয়ে তা তার মুখে দিতে হবে এবং হাত-মুখ পরিস্কার করানোর পর বাচ্চাদের খাবার দিতে হবে।

৩। ডায়রিয়া রোগীর প্রতিবারের পায়খানার সাথে শরীর থেকে পানি বের হতে থাকে। ফলে আস্তে আস্তে রোগীর জলশূন্যতা দেখা দেয়। এতে রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে। এভাবে শরীর অধিক মাত্রায় জলশূন্য হয়ে পড়লে এক পর্যায়ে রোগী মারা যায়। জলশূন্যতা কম হলে রোগী মারা যায় না, কিন্তু তার শরীর দুর্বল ও রোগা হয়ে পড়ে। বাচ্চাদের বেলায় দেহের এ দুর্বলতা ও পুষ্টিহীনতা তাকে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও সবলদেহী মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে দেয় না।

৪। ডায়রিয়ার একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে শরীর থেকে যে পরিমাণ পানি ও লবণ বের হয়ে যায় তা কোন না কোনভাবে পূরণ করে দেয়া। সাধারণতঃ সেলাইন ইনজেকশন ব্যবহার করে তা করা হয়। সেলাইনে পানি, লবণ ও মিষ্টি জাতীয় পদার্থ থাকে। কিন্তু এ সেলাইন ব্যবহারের কিছু অসুবিধা আছে। যেমন, এ সেলাইন সহজে গ্রামদেশে পাওয়া যায় না। ব্যবহারের জন্য ডাক্তারের প্রয়োজন হয় কারণ তা রগ দিয়ে দেহে প্রবেশ করাতে হয় এবং দামও বেশী পড়ে। তাই ডায়রিয়ার সহজ চিকিৎসা হচ্ছে মুখে খাওয়ার সেলাইন। মুখে খাওয়ার সেলাইনেও বাজারের সেলাইনের মত লবণ, পানি ও মিষ্টি জাতীয় পদার্থ থাকে। মুখে খাওয়ার সেলাইন ঘরে বসে নিজের হাতে তৈরী করা যায় এবং তা বানাতে লাগে পানি, লবণ ও গুড়।

৫। রোগী যাতে অধিক জলশূন্য ও দুর্বল হয়ে মারা না যায় বা অপুষ্টিতে না ভোগে তার জন্য রোগ চলাকালীন অবস্থায় তাকে মুখে খাওয়ার সেলাইনের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পানি, ভাত ও তরকারী খাওয়াতে হবে। বাচ্চাদের বেলায় মায়ের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা চলবে না।

৬। মুখে খাওয়ার সেলাইন বানাতে হলে আধাসের কলের বা ফুটানো ঠান্ডা পানি নিতে হবে। এর সাথে তিন আঙ্গুলের প্রথম দাগের সমান এক চিমটি লবণ ও যে কোন গুড় এক মুঠ ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে।

৭। বড়দের প্রতিবার পায়খানার পর আধাসের পরিমাণ মুখে খাওয়ার সেলাইন খাওয়াতে হবে। বাচ্চা যতটুকু খেতে চায় তাকে সে পরিমাণ খেতে দিতে হবে। বাচ্চাদের বারে বারে সেলাইন খাওয়ানো দরকার। প্রথম পাতলা পায়খানার পর পরই এ সেলাইন খাওয়ানো শুরু করতে হবে। ২/৩ বারের পর শুরু করলে এর মধ্যে যে পরিমাণ পানি ও লবণ বেরিয়ে গেছে তা আর পূরণ করা না-ও যেতে পারে। ফলে রোগীর জলশূন্যতা দেখা দেবে ও রোগী দুর্বল হয়ে পড়বে।

৮। লবণ-গুড়-পানির তৈরী এ সেলাইন ব্যবহারের সময় যেসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, তা হলো ঃ

(ক) সেলাইনে যেন লবণের পরিমাণ বেশী না হয়।

(খ) সেলাইন বাচ্চাদের পরিমাণে অল্প ও বারে বারে খাওয়ানো দরকার। কারণ, জোর করে বেশী খাওয়ানোর চেষ্টা করলে বমি লাগতে পারে। বারে বারে না খাওয়ালে পায়খানার সাথে যে পরিমাণ পানি ও লবণ বের হয়ে যায় তা পূরণ করা সম্ভবপর না-ও হতে পারে।

৯। মুখে খাওয়ার সেলাইন ব্যবহারের সময় রোগীর লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলো হলো ঃ

সময় ও নিয়ম মতো এ সেলাইন না খাওয়ানোর ফলে কখনো রোগী যদি মুখ দিয়ে আর কোন কিছু খেতে না পারে এবং রোগীর অবস্থা যদি চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। অনেক সময় সেলাইন খাওয়ানোর পর রোগীর পায়খানা বেড়ে যেতে পারে। এতে কোন অসুবিধা নেই। এ অবস্থায় সেলাইন খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে।

১০। রোগ সারার পর পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ ঃ

ডায়রিয়া সারার পর কমপক্ষে ৭ দিন বেশী পরিমাণে পানি ও খাবার খেতে দিতে হবে। এতে রোগীর পুষ্টিহীনতা ও দুর্বলতা দূর করা সহজ হবে এবং সে পরবর্তীতে সহজে এ রোগ আক্রান্ত হবে না।

ডায়রিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচী/ব্র্যাক

"পাতলা পায়খানা-ডায়রিয়া" ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে মনে রাখার সাতটি পয়েন্ট :

১। পাতলা পায়খানা, আম এবং দুধ রাঙা ডায়রিয়া বা কলেরার প্রথম লক্ষণ। প্রতিবার পাতলা পায়খনার সাথে শরীর থেকে পানি ও লবণ বের হয়ে যায়। এভাবে পাতলা পায়খানা কিছু সময় ধরে চলতে থাকলে বমি, অরুচি, পেট ফাঁপা, হাতে-পায়ে খিঁচুনী লাগা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। তখন পাতলা পায়খানা ডায়রিয়ার রূপ নেয়। এ রোগে আক্রান্ত হলে অনেক সময় রোগীর মৃত্যু ঘটে। তাই পাতলা পায়খানা শুরু হলে তাকে অবহেলা না করে সময়মত ব্যবস্থা নিয়ে ডায়রিয়া বা কলেরার হাত থেকে আমাদের বাঁচতে হবে।

২। এ রোগের হাত থেকে বাঁচতে হলে আমাদের টিউবওয়েলের পানি পান করতে হবে, টিউবওয়েলের পানি না পেলে পানি ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে পান করতে হবে। বাসি-পচা খাবার খাওয়া বন্ধ করতে হবে। খাবার জিনিস সব সময় ঢেকে রাখতে হবে, যাতে মাছি না বসতে পারে। খাবার আগে হাত-মুখ পরিস্কার করে ধুয়ে নিতে হবে।

মনে রাখবেন, মায়ের দুধে কোন দোষ নেই। অপরিস্কার স্তন মুখে দেয়ার ফলে সাধারণতঃ ছোট বাচ্চাদের এ রোগ হয়। স্তন পরিস্কার করে ধুয়ে তাদের মুখে দিতে হবে এবং বাচ্চাদের হাত-মুখ পরিস্কারের পর খেতে দিতে হবে।

৩। পাতলা পায়খানা-ডায়রিয়ার একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে শরীর থেকে যে পরিমাণ পানি ও লবণ বের হয়ে যায় তা কোন না কোন ভাবে পূরণ করে দেয়া। সাধারণতঃ স্যালাইন ইনজেকশান ব্যবহার করে তা করা হয়। স্যালাইন পানি, লবণ ও মিষ্টি জাতীয় পদার্থ থাকে। কিন্তু এ স্যালাইন ব্যবহারের কিছু অসুবিধা আছে : যেমন -- এ স্যালাইন সহজে গ্রামে পাওয়া যায় না। ব্যবহারের জন্য ডাক্তারের প্রয়োজন হয়। কারণ তা শিরা দিয়ে দেহে প্রবেশ করাতে হয়। এবং খরচও বেশী পড়ে। তাই পাতলা পায়খানা যাতে ডায়রিয়ার রূপ না নেয় তার জন্য পাতলা পায়খানার শুরুতেই চিকিৎসা করা দরকার। এর সহজতম চিকিৎসা হচ্ছে মুখে খাওয়ার স্যালাইন। মুখে খাওয়ার স্যালাইনেও বাজারের স্যালাইনের মত পানি, লবণ ও মিষ্টি জাতীয় পদার্থ থাকে। মুখে খাওয়ার স্যালাইন ঘরে বসে নিজের হাতে তৈরী করা যায় এবং বানাতে লাগে শুধুমাত্র পানি, লবণ ও গুড়।

৪। মুখে খাওয়ার স্যালাইন বানাতে হলে আধাসের কলের বা ফুটানো ঠাণ্ডা পানির সাথে তিন আঙ্গুলের প্রথম দাগের সমান এক চিমটা লবণ ও যেকোন গুড় একমুঠি ভালভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। স্যালাইন বানাবার সময় লবণ, গুড় ও পানির পরিমাণ অবশ্যই ঠিক রাখতে হবে।

৫। প্রথম পাতলা পায়খানার পর পরই এ স্যালাইন খাওয়ানো শুরু করতে হবে। দুই-তিন বারের পর শুরু করলে এর মধ্যে যে পরিমাণ পানি ও লবণ বেরিয়ে আসে তা পূরণ করা নাও যেতে পারে। ফলে রোগীর জলশূণ্যতা দেখা দেবে ও রোগী দূর্বল হয়ে পড়বে। এভাবে রোগী বেশী জলশূন্য হয়ে পড়লে তখন স্যালাইন ইনজেকশনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে।

৬। বড়দের প্রতিবার পায়খানার পর আধাসের পরিমাণ মুখে খাওয়ার স্যালাইন খাওয়াতে হবে। যতটুকু খেতে চায় তাকে সেই পরিমাণ খেতে দিতে হবে। বাচ্চাদের বারে বারে স্যালাইন খাওয়ানো দরকার।

৭। পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ ঃ রোগ চলাকালীন অবস্থায় মুখে খাওয়ার স্যালাইন-এর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পানি, ভাত ও তরকারী খাওয়াতে হবে। বাচ্চাদের বেলায় মায়েদের বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা চলবে না। রোগ সারার পর কমপক্ষে সাতদিন রোগীকে বেশী পরিমাণে পানি ও খাবার খেতে দিতে হবে। এতে রোগীর পুষ্টিহীনতা ও দুর্বলতা দূর করা সহজ হবে এবং পরবর্তীতে সহজে এ রোগে আক্রান্ত হবে না।

ডায়রিয়া একটি মারাত্মক রোগ

ডায়রিয়া প্রতিরোধ করুন

ডায়রিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচী, ব্র্যাক

"পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া" ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে মনে রাখার সাতটি পয়েন্ট :

১। পাতলা পায়খানা, দাস্ত, দুধহাগা, কলেরা ও আমাশয়কে এক কথায় ডায়রিয়া বলে। প্রতিবার পাতলা পায়খানার সাথে শরীর থেকে পানি ও লবণ বের হয়ে যায়। এভাবে পাতলা পায়খানা কিছু সময় ধরে চলতে থাকলে পিপাসা, অরুচি, বমি, পেটফাঁপা, হাতে-পায়ে খিঁচুনিলাগা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। এ রোগে আক্রান্ত হলে পুষ্টিহীনতা হয় ও অনেক সময় রোগীর মৃত্যু ঘটে। তাই ডায়রিয়া শুরু হলেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

২। এ রোগের হাত থেকে বাঁচতে হলে আমাদের টিউবওয়েলের পানি পান করতে হবে। টিউবওয়েলের পানি না পেলে পানি ফুটিয়ে ঠান্ডা করে পান করতে হবে। বাসি-পচা খাবার খাওয়া বন্ধ করতে হবে। খাবার জিনিস সব সময় ঢেকে রাখতে হবে, যাতে মাছি না বসতে পারে। খাবার আগে সাবান বা পরিষ্কার পানি দিয়ে হাত-মুখ ধুতে হবে। পায়খানার পর সাবান বা ছাই দিয়ে হাত ধুতে হবে। মনে রাখবেন মায়ের দুধে কোন দোষ নেই। বরং যে সকল বাচ্চা প্রথম থেকেই মায়ের দুধ খায় তাদের ডায়রিয়া কম হয়।

৩। পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়ার একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে শরীর থেকে যে পরিমাণ পানি ও লবণ বের হয়ে যায় সেই পরিমাণ পানি ও লবণ পূরণ করে দেয়া। এর সহজতম চিকিৎসা হচ্ছে মুখে খাওয়ার স্যালাইন। এ স্যালাইন ঘরে বসে নিজের হাতে তৈরী করা যায় এবং বানাতে লাগে শুধুমাত্র পানি, লবণ, গুড় অথবা চিনি। আমাশয় হলেও মুখে খাওয়ার স্যালাইন খাওয়াতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

৪। মুখে খাওয়ার স্যালাইন বানাতে হলে আধাসের কলের বা ফুটানো ঠান্ডা পানির সাথে তিন আঙ্গুলের প্রথম দাগের সমান এক চিমটি লবণ ও যেকোন গুড় একমুঠ ভালভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। স্যালাইন বানাবার সময় লবণ, গুড় ও পানির পরিমাণ অবশ্যই ঠিক রাখতে হবে। গুড় না পেলে এক মুঠ চিনি ব্যবহার করা যাবে।

৫. প্রথম পাতলা পায়খানার পর পরই এ স্যালাইন খাওয়ানো শুরু করতে হবে। দুই-তিন বারের পর শুরু করলে এর মধ্যে যে পরিমাণ পানি ও লবণ বেরিয়ে আসে তা পূরণ করা কঠিন হবে। ফলে রোগীর জলশূন্যতা দেখা দেবে অর্থাৎ চোখ কোটরে বসে যাবে, জিহ্বা শুকিয়ে যাবে বাচ্চাদের মাথার তালু বসে যাবে ও রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় ডাক্তার দেখাতে হবে।

৬। বড়দের প্রতিবার পায়খানার পর আধাসের পরিমাণ মুখে খাওয়ার স্যালাইন খাওয়াতে হবে। বাচ্চা যতটুকু খেতে চায় তাকে সেই পরিমাণ খেতে দিতে হবে। বাচ্চাদের বারে বারে স্যালাইন খাওয়ানো দরকার। একবার বানানো খাওয়ার স্যালাইন আধা বেলা (ছয় ঘন্টা) রাখা যায়।

৭। পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ ঃ রোগ চলাকালীন অবস্থায় মুখে খাওয়ার স্যালাইন-এর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পানি, ভাত ও তরকারী খাওয়াতে হবে। বাচ্চাদের বেলায় মায়েদের বুকের দুধ বা অন্যান্য স্বাভাবিক খাবার খাইয়ে যেতে হবে। রোগ সারার পর কমপক্ষে সাতদিন রোগীকে বেশী পরিমাণে খাবার খেতে দিতে হবে। এতে রোগীর পুষ্টিহীনতা ও দুর্বলতা দূর করা সহজ হবে এবং পরবর্তীতে সহজে এ রোগ আক্রান্ত হবে না।

ডায়রিয়া একটি মারাত্মক রোগ

ডায়রিয়া প্রতিরোধ করুন

শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচী, ব্র্যাক

দুধহাগা, অজীর্ণ, আমাশয় বা কলেরা ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে মনে রাখার সাতটি পয়েন্ট।

১। দুধহাগা, অজীর্ণ, আমাশয়, ডায়রিয়া বা কলেরা কি এবং এর ভয়াবহতা

দুধহাগা, অজীর্ণ, আমাশয়, ডায়রিয়া বা কলেরা হলে পাতলা পায়খানা হয়। প্রতিবার পাতলা পায়খানার সাথে শরীর থেকে লবণ ও পানি বের হয়ে যায়। এভাবে কিছু সময় ধরে লবণ ও পানি শরীর থেকে বের হতে থাকলে শরীর পানিশূন্য হয়ে পড়ে। শরীর বেশী পানিশূন্য হয়ে পড়লে এক পর্যায়ে রোগীর মৃত্যু ঘটে। তাই দুধহাগা, অজীর্ণ, আমাশয়, ডায়রিয়া বা কলেরায় পাতলা পায়খানা হলে প্রথম থেকে মুখে খাবার স্যালাইন খাওয়ানো উচিত।

২। পানিশূন্যতার লক্ষণ

বেশী পানিশূন্যতার লক্ষণ হচ্ছে চোখ কোটরে বসে যাবে, জিহ্বা শুকিয়ে যাবে, বাচ্চাদের মাথার তালু বসে যাবে, রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়বে, প্রস্রাব কমে যাবে এবং হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে ও খিঁচুনি দেখা দিতে পারে।

৩। পানিশূন্যতা রোধ

পানিশূন্যতা রোধের সহজ পথ হচ্ছে শরীর থেকে যে পরিমাণ পানি ও লবণ বেরিয়ে যায় তা পূরণ করে দেয়া। কারণ রোগী মারা যায় পানিশূন্যতার জন্যই। তাই পানিশূন্যতা রোধ করার জন্য দুধহাগা, অজীর্ণ, আমাশয়, ডায়রিয়া বা কলেরা যে কোন কারণেই পাতলা পায়খানা হোক না কেন প্রথম থেকেই রোগীকে মুখে খাওয়ার স্যালাইন খাওয়ানো প্রয়োজন। প্রথম থেকে খাওয়ানো শুরু না করলে রোগীর পানিশূন্যতা দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত পানিশূন্যতা দেখা দিলে বা রোগী স্যালাইন মুখে না খেতে পারলে ডাক্তার দেখাতে হবে। তবে আমাশয়ের বেলায় প্রথম থেকেই ডাক্তার দেখাতে হবে।

৪। মুখে খাবার স্যালাইন বানানোর নিয়ম

আধাসের খাবার পানির সাথে তিন আঙ্গুলের প্রথম দাগের সমান এক চিমটি লবণ ও একমুঠ যে কোন ধরনের গুড় ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। স্যালাইন বানানোর সময় লবণ, গুড় ও পানির পরিমাণ অবশ্যই ঠিক রাখতে হবে। গুড় না পেলে একমুঠ চিনি ব্যবহার করা যাবে।

৫। খাওয়ানোর নিয়ম

বড়দের প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর আধাসের পরিমাণ মুখে খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে। বাচ্চা যতটুকু খেতে চায় তাকে সেই পরিমাণ খেতে দিতে হবে। বাচ্চাদের বারে বারে স্যালাইন খাওয়ানো দরকার। একবার বানানো স্যালাইন আধাবেলা (ছয় ঘন্টা) রাখা যায়।

৬। পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ

রোগ চলাকালীন অবস্থায় মুখে খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পানি, ভাত ও তরকারী খাওয়াতে হবে। বাচ্চাদের বেলায় মায়ের বুকের দুধ, পানি ও অন্যান্য স্বাভাবিক খাবার খাইয়ে যেতে হবে। রোগ সারার পর কমপক্ষে সাতদিন রোগীকে বারে বারে একটু বেশী পরিমাণ খাবার খেতে দিতে হবে। এতে রোগীর পুষ্টিহীনতা ও দুর্বলতা দূর করা সম্ভব হবে।

৭। প্রতিরোধ

দুধহাগা, অজীর্ণ, আমাশয়, ডায়রিয়া বা কলেরার হাত থেকে বাঁচতে হলে আমাদের টিউবওয়েলের পানি পান করতে হবে। টিউবওয়েলের পানি না পেলে পানি ফুটিয়ে ঠান্ডা করে পান করতে হবে। বাসি-পচা খাওয়া উচিত নয়। খাবার জিনিস সব সময় ঢেকে রাখতে হবে যাতে মাছি বসতে না পারে। খাবার আগে সাবান বা পরিস্কার পানি দিয়ে হাত মুখ ধুতে হবে। পায়খনার পর এবং বাচ্চাদের পায়খানা পেষে ধোয়ানোর পর সাবান বা ছাই দিয়ে হাত ধুতে হবে। রোগীর পায়খানা কোন নির্দিষ্ট স্থানে মাটিতে পুঁতে রাখুন। মনে রাখবেন, মায়ের দুধে কোন দোষ নেই। বরং যেসব বাচ্চা জন্মের ঠিক পর থেকেই মায়ের দুধ খায় তাদের ডায়রিয়া কম হয়।

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন

সুস্থ থাকুন।

ডায়রিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচী/ব্র্যাক

ডায়রিয়া বা কলেরা রোগে যাতে জলশূন্য হয়ে রোগী মারা না যায় সে জন্য ব্র্যাক ডায়রিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। ডায়রিয়া রোগের লক্ষণ, তার সহজ চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে গ্রামের লোকদের শিক্ষা পাওয়ার জন্য গ্রাম পর্যায়ে রয়েছে মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী -- ও.আর.ডব্লিউ।

ও.আর.ডব্লিউদের সুষ্ঠু আচরণ ও কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর করে কর্মসূচীর উদ্দেশ্যের সফল বাস্তবায়ন। এরজন্য প্রয়োজন কিছু নিয়ম শৃংখলা মেনে চলা -- যা তাদের আচরণ ও কর্মদক্ষতা উন্নত করতে সাহায্য করবে। ও.আর. ডব্লিউদের যেসব নিয়ম গ্রাম ও শিবির পর্যায়ে কঠোর ভাবে মেনে চলতে হবে তা নিচে দেয়া হল ঃ

গ্রাম পর্যায়ে ঃ

ক. পরিবারে ঐ সময় পাতলা পায়খানা করে এমন কেউ আছে কিনা তা খোঁজ করুন। এধরনের রোগী পাওয়া গেলে তাকে লবণ-গুড়ের স্যালাইন খাওয়ান এবং টি.সি.কে রোগীর তত্ত্বাবধানের জন্য খবর দিন।

খ. "পাতলা পায়খানা -- ডায়রিয়া" ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে কথাগুলো ফ্লিপ চার্টের মাধ্যমে মহিলাদের শেখান।

গ. সব সময়ই একজন মহিলাকে নিয়ে শিক্ষাদান করুন।

ঘ. শিক্ষা প্রাপ্ত মহিলাকে দিয়েই স্যালাইন তৈরী করাবেন।

ঙ. স্যালাইন বানানো শেখানোর পর সেই পরিবারে আধসের পরিমাণ পানি ধরে এমন পাত্র খোঁজ করুন।

চ. আধসের পানি ধরে এমন পাত্র পেলে সেটাই ঠিক রাখার জন্য মহিলাকে বলুন; না পেলে অন্য যেকোন পাত্রে আধসেরের সমান দাগ দিয়ে আসুন। খেয়াল রাখতে হবে যাতে দাগ স্পষ্ট হয়।

ছ. স্যালাইন বানাবার পর নিজে তার স্বাদ গ্রহণ করুন এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলাকে দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করান।

জ. শিক্ষাদানের সময় ডায়রিয়া কি, স্যালাইন বানানো ও ব্যবহারের নিয়ম এবং কখন থেকে খাওয়ানো শুরু করতে হবে এই চারটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বের সাথে বুঝান।

ঝ. শিক্ষাদান শেষ হলে মহিলা সব কটি পয়েন্ট বুঝতে পেরেছেন কিনা তা যাচাই করুন। অর্থাৎ মহিলাকে সব কটি প্রশ্ন করুন এবং তার উত্তর শুনুন।

ঞ. কোন উত্তর ভুল হলে সেই পয়েন্টটি মহিলাকে আবার ভাল করে বুঝান এবং যাচাই করুন।

ট. শিক্ষাদানের সময় কথাগুলো স্পষ্ট করে বলুন।

ঠ. শিক্ষাদানের সময় মহিলা কথাগুলো বুঝতে পারছেন কিনা তা লক্ষ্য করুন।

ড. গ্রামে কোন পরিবার যাতে বাদ না পড়ে সে দিকে সতর্ক থাকতে হবে।

ঢ. সহকর্মীদের প্রতি আপনাকে সহানুভূতিশীল হতে হবে। গ্রামে নিজে শেখানোর জন্য ব্যস্ত না হয়ে বরং সঙ্গীদের খোঁজ খবরও রাখার চেষ্টা করুন।

ণ. গ্রামে সহকর্মীদের নাম ধরে প্রকাশ্যে ডাকাডাকি করবেন না।

ত. শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলাকে বলে আসুন যে, তিনি যা শিখেছেন তা যেন পরিবারের অন্য সবাইকে ঐ দিনই শিখিয়ে দেন।

থ. শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলার নাম ডায়েরীভুক্ত করুন।

দ. অশোভনীয় কোন পোষাক পরে গ্রামে যাওয়া যাবে না।

ধ. গ্রামে ও পথে চলার সময় ছাতা মাথায় দিয়ে চলুন।

শিবির পর্যায়ে ঃ

ক. সকাল ৮ টার মধ্যে ফিল্ডে যাবেন এবং বিকাল ৪ টার মধ্যে ফিরে আসবেন।

খ. একসাথে ফিল্ডে যাবেন ও একসাথে ফিরে আসবেন।

গ. রাত ১০ টার মধ্যে সব কাজ শেষ করে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিন।

ঘ. সপ্তাহে মাত্র একদিন সাপ্তাহিক মিটিং হবে এবং তা বেলা ১ টার ভেতর শেষ করতে হবে।

ঙ. একসাথে একাধিক ও.আর.ডব্লিউ. টি.সি-দের কক্ষে ডায়েরী দিয়ে আসবেন এবং ত্রুটি সংশোধনের পর একই ভাবে তা নিয়ে আসবেন।

চ. টিমের ছোটখাট সমস্যা টিমের ও.আর.ডব্লিউ লিডারের কাছে পেশ করুন। লিডার সমাধান করতে ব্যর্থ হলে, লিডার তা টি.সি'র নজরে আনবেন এবং সবাই মিলে তার সমাধান করবেন।

ছ. কোন কাজে টি.সি'র কক্ষে ঢুকতে হলে টি.সি.দের অনুমতি নিয়ে একসাথে একাধিক ও.আর.ডব্লিউ ঢুকবেন। ও.আর.ডব্লিউদের কক্ষে ঢোকার সময় টি.সি. এবং বাবুর্চিদের বেলায়ও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

জ. রাত্রে কোন অবস্থাতেই ও.আর.ডব্লিউ'রা টি.সি.দের কক্ষে যেতে পারবেন না।

ঝ. টি.সি. এবং ও.আর.ডব্লিউরা যার যার কক্ষে খাওয়া দাওয়া করবেন। খাবার পরিবেশনের দায়িত্ব থাকবে বাবুর্চির।

ঞ. ও.আর.ডব্লিউদের তালিকাভুক্ত আত্মীয় স্বজনেরা সরাসরি তাদের সাথে দেখা করতে পারবেন না। টি.সি.র সাথে আলাপের পরই তার অনুমতি সাপেক্ষে দেখা করতে পারবেন।

ট. কোন অবস্থাতেই টিমে গান বাজনার আয়োজন করা যাবে না।

ঠ. সবাইকে একত্রে একই মেসে থাকা খাওয়ার সম্মিলিত নিয়ম মেনে চলতে হবে।

ড. সপ্তাহ শেষে সাপ্তাহিক রিপোর্ট টি.সি.র কাছে জমা দিন।

ঢ. কোন অবস্থাতেই একজন ও.আর.ডব্লিউকে একা শিবিরে রেখে ফিল্ডে যাবেন না।

ণ. সকলেই পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে নজর রাখুন। পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সবাই যত্নবান হোন।

H2 OTEP.(1).82P/T-3

ব্র্যাক

ডায়রিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচী

কর্মসূচী : আলোচনা ভিত্তিক কর্মশিবির

বিষয় : ডায়রিয়া ও তার সহজ চিকিৎসা মুখে খাবার স্যালাইন

অংশগ্রহণকারী : গ্রাম্য চিকিৎসক

উদ্দেশ্য : অংশগ্রহণকারীদের ডায়রিয়া, কলেরা ও তার সহজ চিকিৎসা সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত ধারনা দেয়া।

> গোড়াতেই পরিচিতি পর্বের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের সহজ করে নিতে হবে। প্রতিটি প্রসংগ আলোচনার আগে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকা উচিত। সব জায়গার উপমা ও বাস্তব উদাহরণ আলোচনাকে সাহায্য করবে।

ডায়রিয়া :

পাতলা পায়খানা ডায়রিয়া বা কলেরার প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ। পৃথিবীর যে কোন অনুন্নত দেশের মতো আমাদের দেশেও এটি একটি সাধারণ ও নিত্যনৈমিত্তিক রোগ। জীবনে দু'চার বার বড় রকমের ডায়রিয়া হয়নি এমন লোক এ দেশে বিরল। এক হিসাবে দেখা গেছে যে ৫ বছর বয়সে পৌঁছুবার আগেই প্রায় প্রতিটি শিশুই অন্ততঃ দু'বার ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়। তাই এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে, নিতে হবে সম্ভব সব রকমের সতর্কতা।

ডায়রিয়ার লক্ষণ ও প্রকার :

আগেই বলা হয়েছে যে পাতলা পায়খানা হলো ডায়রিয়ার প্রথম ও প্রধান লক্ষণ। সাথে কখনো বমি বা অন্যান্য উপসর্গ থাকতে পারে। প্রকোপের ওপর ভিত্তি করে ডায়রিয়ার লক্ষণগুলিকে বিচার করা যেতে পারে। এই পাতলা পায়খানা দু'একবার হয়েই থেমে যেতে পারে। কখনো বেশ কয়েকবার হয়ে থামে; কিন্তু ততক্ষণে রোগী খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার কখনো এত বেশী পাতলা পায়খানা ও বমি হতে থাকে যে রোগী চরম দুর্বল হয়ে মারাও যায়। সাধারণ পেটের অসুখ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকমের আমাশা, খাদ্যে বিষক্রিয়া, কলেরা ইত্যাদি সবকিছুরই প্রাথমিক লক্ষণ হলো পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া। বাচ্চাদের দুধ হাগাও সেই অর্থে এক ধরনের ডায়রিয়া। হামের সময় বাচ্চাদের যে পাতলা পায়খানা হয় তাও এর অন্তর্ভুক্ত।

ডায়রিয়া কেন এবং কিভাবে হয় :

বিভিন্ন প্রকার জীবাণু থেকে প্রধাণতঃ ডায়রিয়া হয়। এই জীবণুগুলির মধ্যে রয়েছে এ্যামিবা, বেসিলাস যথা শিগেলা ইত্যাদি, রোটাভাইরাস, ভিব্রিও কলেরা ইত্যাদি। এ সমস্ত জীবাণু খালি চোখে দেখা যায় না। দুষিত পানি পান ও ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে ডায়রিয়ার এইসব জীবাণু দ্রুত ও বেশী পরিমাণে ছড়ায়। বাসি-পচা বা মাছি বসা খাবারের মধ্য দিয়েও এইসব জীবাণু মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। হাত, নখ, বাসনপত্র ইত্যাদি অপরিস্কার থাকলে খাবার সময় জীবাণু শরীরে প্রবেশ করতে পারে। মায়ের স্তনের বোঁটা পরিস্কার না থাকলে তা মুখে দিয়ে শিশুদের ডায়রিয়া হয়। আবার বেশী খাওয়া, গুরুপাক খাওয়া, বদহজম ইত্যাদির কারণেও পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে। অপুষ্টির কারণেই মানুষ সহজে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়। বারবার ডায়রিয়া হলে পুষ্টির ভিত ভেংগে পড়ে এবং এক পর্যায়ে মানুষ মারা যায়।

ডায়রিয়া হলে কি হয় ?

ডায়রিয়ায় পাতলা পায়খানা ও বমির আকারে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণ পানি ও লবণ জাতীয় পদার্থ বেরিয়ে যায়। এই পানি বেরিয়ে গেলে শরীরে জলশুণ্যতার সৃষ্টি হয়। এতে রোগী দ্রুত দূর্বল হয়ে পড়তে শুরু করে। গোড়ার দিকে তার তৃষ্ণা বেড়ে যায় মুখ, গলা শুকিয়ে যায়। ধীরে ধীরে চোখ বসে যায়। শিশুদের ক্ষেত্রে মাথায় তালুর গর্ত গভীরভাবে ভেসে উঠে। শিরার গতি দ্রুততর হয়। এ অবস্থা চলতে থাকলে জলশুন্যতা বাড়তে থাকে এবং এক সময়ে রোগী বসে থকার শক্তি হারায়। খাবার ক্ষমতা লোপ পায়, চামড়ায় খসখসে ভাব আসে, চিমটি দিলে তা কুচকে থাকে, ওজন কমে যায়, তার কথা বন্ধ হয়ে আসে, নিঃশ্বাস দ্রুত অথচ দীর্ঘ হয়, পায়খানা প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায় এবং কাঁদলেও চোখে পানি আসে না। এর চূড়ান্ত অবস্থায় রোগীর মৃত্যু ঘটে।

হালকা, মাঝারী বা তীব্র, যে কোন প্রকোপের ডায়রিয়াই রোগীর জন্য ক্ষতিকর। যেহেতু কোন ধরনের ডায়রিয়া মারাত্মক পরিনতির রূপ নেবে তা আমরা আগে থেকে বলতে পারি না, সেহেতু লক্ষণ প্রকাশ পাবার সাথে সাথেই নিতে হবে প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা।

আগেই বলা হয়েছে যে বিশেষ কিছু জীবাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করলে ডায়রিয়া দেখা দেয়। শরীরের স্বাভাবিক কর্ম হলো অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত কিছু থাকলে তা শরীর থেকে বের করে দেয়া। এ্যামিবা, বেসিলাস, শিগেলা, রোটাভাইরাস, ভিব্রিও, কলেরা ইত্যাদির যে কোনটি আমাদের অজ্ঞতা ও অসাবধানতার সুযোগে শরীরে প্রবেশ করা মাত্র শরীর তা ধুয়ে বের করে দেবার কাজ শুরু করে। এই প্রক্রিয়ারই বাহ্যিক রূপ হলো পাতলা পায়খানা এবং বমি। এর ফলে শরীরের পানির সাথে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, বাইকারবোনেট ইত্যাদিও কমবেশী পরিমানে বেরিয়ে আসে। এসবের ঘাটতির ফলে শরীরে নানান লক্ষণ দেখা দেয়। পটাশিয়ামের অভাবে হাতে-পায়ে খিচুনী, পেট ফাঁপা, অমনোযোগিতা, মানসিক দৌর্বল্য, ঘন ঘন প্রস্রাব ইত্যাদি প্রকাশ পায়। এর বাড়তি ঘাটতিতে নাড়ীর গতি দ্রুততর হয়। সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাবার লবণের অভাব হলে ক্ষুধা মন্দা

বমি বমি ভাব, রক্তচাপ হ্রাস ও নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পায়। চেহারা ফ্যাকাশে এবং হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে। চরম পর্যায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয় এবং পায়খানা প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। বাইকার্বনেটের অভাবে শরীরে এসিডের পরিমান বেড়ে যায়। যার ফলে বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে। এর ফলে কিডনির কর্মক্ষমতাও ব্যহত হয়। এগুলির অতিরিক্ত অভাব শরীরকে দুর্বল করে রোগীর অবস্থাকে জটিল করে তোলে এবং মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে। ডায়রিয়ায় তীব্র ভাবে আক্রান্ত রোগী বেঁচে থাকলে সে অপুষ্টি কবলিত হয়ে চিররুগ্ন হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে ডায়রিয়াসহ অন্যান্য অনেক রোগে ঘন ঘন আক্রান্ত হতে থাকে।

ডায়রিয়ার চিকিৎসা ঃ

ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি যে বিশেষ কতগুলো জীবানু শরীরে প্রবেশ করার ফলে ডায়রিয়া দেখা দেয়। শরীর এই জীবানুগুলিকে ধুয়ে বের করে দিতে চায় - যার বাহ্যিক রূপ হলোপাতলা পায়খানা এবং বমি। এই প্রক্রিয়া ১ থেকে ৬ দিন পর্যন্ত চলতে পারে। এইভাবে অবাঞ্চিত জীবানুগুলি বেরিয়ে গেলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠে। কিন্তু ততক্ষণে জলশূন্যতার কারণে রোগী তীব্র পুষ্টিহীনতার শিকার হয়ে জীবন্মৃত হয়ে পড়ে। মনে রাখতে হবে যে ঔষধপত্র ব্যবহার করে রোগীর পায়খানা বমি বন্ধ করে দেওয়াটাই ডায়রিয়া সারানো নয়। বরং জীবাণুগুলিকে যথাশীঘ্র সম্ভব বের করে দিয়ে শরীরে পানির ঘাটতি পূরণ ও পুষ্টি যোগানোই হলো এ রোগের প্রকৃত চিকিৎসা।

এজন্য ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীকে শুরু থেকেই লবণ-পানি সরবরাহ করতে হবে। এই পানি শরীরকে জীবানু ধুয়ে ফেলার প্রক্রিয়ায় সরাসরি সহযোগিতা করবে এবং জলশূন্যতা রোধ করে রোগীকে সবল রাখবে। এ পর্যন্ত আবিস্কৃত ডায়রিয়া কলেরার অন্যতম নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা হচ্ছে স্যালাইন ইনজেকশন। এর বিকল্প হিসাবে বাজারে রয়েছে ওরালাইট নামের স্যালাইন প্যাকেট যা পানির সাথে মিশিয়ে খেতে হয়। এই পদ্ধতিগুলি প্রাপ্তি, ক্রয় করার সংগতি, তার যথাযথ ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তব কিছু সমস্যা রয়ে গেছে বলে এখনও এদেশের লোক ডায়রিয়ার মরে। ডায়রিয়া চিকিৎসার জন্য আমাদের দেশে এলাকা ভেদে বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। ঝাড়-ফুক তুক-তাক থেকে শুরু করে হেকিমী, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথি কোনটাই এ ব্যবস্থা থেকে বাদ নেই। এলোপ্যাথিতে নানারকম বড়ি, তরল ওষুধ এবং সিরাপ ছাড়াও রয়েছে অন্য রকমের এন্টিবায়োটিক। এ সমস্ত ঔষুধে রোগ নিরাময় হয় ঠিকই কিন্তু আসলে তা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। আবার এইসব জীবানু রোগ সংক্রমনেও কাজ করে। কাজেই জীবানুকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়াই নিরাপদ ব্যবস্থা।

লবণ-গুড় জলের স্যালাইন :

এসব বাস্তব অবস্থাকে বিবেচনা করে ব্র্যাক সহজ, নিরাপদ ও কার্যকর এক খাওয়ার স্যালাইন উদ্ভাবন করেছে। এ স্যালাইন ঘরে বসেই আধাসের খাবার পানির সাথে তিন আঙ্গুলের এক চিমটি লবণ আর একমুঠি গুড় মিশিয়ে বানানো যায়। লবণই হলো সোডিয়াম যা শরীরের জন্য জরুরী। শুধু লবণ-পানি শরীরে প্রবেশ করানো কঠিন, এক্ষেত্রে গুড়, লবণ ও পানির বাহন হিসাবে কাজ করে। এই গুড় হলো সুক্রোজ যা গ্লুকোজের কাজ করে। এতে কিছু পটাশিয়ামও রয়েছে। স্যালাইনে মিষ্টি জাতীয় পদার্থ থাকলে শরীর তা দ্রুত শুষে নিতে পারে ফলে রোগীও তাড়াতাড়ি শক্তি ফিরে পায়। আর সেজন্যই কোন রকম দেরী না করে প্রথমবার পাতলা পায়খানা করার পর থেকেই এই স্যালাইন খাওয়াতে শুরু করতে হবে। বড়দের ক্ষেত্রে এর মাত্রা হবে প্রতি দাস্তের পর আধাসের। আর শিশুদের ক্ষেত্রে তারা যতটুকু খেতে চায় ততটুকুই দিতে হবে। এ স্যালাইন শরীরের জলশূন্যতা রোধের পাশাপাশি অবস্থিত জীবাণু ধুয়ে বের করে দিতে শরীরকে সাহায্য করে এবং শরীরকে দূর্বল হতে দেয় না। দু'একবার স্যালাইন খাইয়েই এইসব জীবাণু সম্পূর্ণ বের করে দেয়া সম্ভব নয় বলে ডায়রিয়া চলাকলীন সময়ে বার বার স্যালাইন খাওয়াতে হবে। গোড়ার দিকে এ স্যালাইন খাওয়ার সময় কারো কারো বমি ভাব আসতে পারে, কারো কারো দাস্তও বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু এ অবস্থা নিতান্ত সাময়িক এবং তখনও স্যালাইন খাওয়া চালিয়ে যেতে হবে।

লবণ-গুড় জলের স্যালাইন খাওয়াতে শরীরের উপকার ছাড়া কোনভাবেই কোন ক্ষতি নেই। কারণ এ স্যালাইন শরীরের রোগ জীবাণু ধুয়ে বের করে দিতে সাহায্য করে, শরীরে পুষ্টি ও শক্তি যোগায়, বাড়ায় রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা।

আরও কিছু জরুরী কথা :

ডায়রিয়া চলাকালীন সময়ে বারবার স্যালাইন খাওয়ানোর পাশাপাশি বেশী পরিমানে পানি খাওয়াতে হবে। বারকয়েক ডাবের পানি দিতে পারলে আরও ভালো- এতে প্রয়োজনীয় পটাশিয়াম ও বাইকার্বোনেট রয়েছে। এ ব্যাপারে পাকা কলা, পেঁপে, আম, এসব সাহায্য করবে। ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীকে অভুক্ত রাখা খুবই ক্ষতিকর। এসময়েও তাকে স্বাভাবিক নিয়মে ভাত, ডাল, মাছ, শাক-সবজি খাওয়ানো দরকার। শিশুদের বেলায় মায়ের দুধ অবশ্যই খাওয়াতে হবে। বড়দের বেলায় হাত, মুখ ও থালা-বাসন ভালভাবে পরিস্কার করে নিয়ে খেতে হবে। খাবার সব সময় ঢেকে রাখা উচিত। খাবার ও ব্যবহারের যাবতীয় পানিকে হতে হবে যথা সম্ভব বিশুদ্ধ। এ ব্যাপারে কলের পানি যথেষ্ট নিরাপদ। ডায়রিয়া রোগীর মল ও বমি মাটিতে গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে যাতে তা আর না ছড়ায়।

BRAC/OTEP

CHECKLIST FOR AREA MANAGER

ORW TEAM :

1. Pre-Operation Study :

   -- Query on activity on return of team.

   -- Physical verification while visiting team (if possible before ORW operation starts) :

      i) Meet with Upazila Chairman/UNO

      ii) Meet with UH & FPO and UEO

      iii) Meet with other Government & Non-Governmental institutional heads

      iv) Posters in important places & offices

2. Pre-Contact :

   -- Meet with U.P. Chairman

   -- Meet With base - village member

   -- 15-20 male interview of base and one operated village

3. School Forum :

   -- Base School visit

   -- Furthest school visit

   -- Presence in one school forum

4. Mosque forum :

   -- Discussion with Imam of base mosque

   -- Discussion with any one Imam of any one operated village.

5. Seminar :

   a. Male

      -- To attend one seminar

      -- To discusss with 5-6 core participants (including quack) of seminar conducted earlier.

   b. Quack

      -- To attend in seminar

      -- Meet with some quack

      -- Meet with available Pharmacy Assistants

6. Publicity :

   -- Checking of Posters -- Office, U.P. office, Pharmacy, School, Hotel, Barbar shop.

7. Patient care follow-up.

   -- Interview with 2-3 patient already cared previous day

   -- To talk with attendants of demonstration meeting

8. Supervision :

   -- To check the diary of P.O. & ORW

   -- To see Physically reality of feed-back on following day.

   -- Practical observation of the process of supervision of minimum 2 ORWs.

   -- Spot checking of previous ORW work :

      -- Mog Checking

      -- LGS preparation by taught women

      -- Enquiry on points (important)

   -- Meeting with ORWs, if necessary

9. Management, administration & accounts :
    - -- Daily Roster
    - -- Diary
    - -- Files and registers, reports
    - -- Stock & accounts
    - -- Discussion with all members

REINFORCEMENT TEAM :

1. Monitoring :
    - -- Compare rough list with final form
    - -- Sample vial checking
    - -- 4-5 interviewed women follow-up
    - -- Physical observation of minimum 2 monitoring of individual P.O.
2. Reinforcement :
    - -- To discuss with 5-6 core participants of seminar already conducted.
    - -- To attend atleast one seminar
    - -- Interview with 4 pts. of QRW team followed-up by reinforcement team
    - -- To attend one demonstration meeting.
3. Usage Survey :
    - -- To check survey register
    - -- Attend physically 3 users & 3 non-users of LGS
    - -- Physical presence during survey for 1 day atleast.

4. Management, administration & accounts :

-- Daily Roster

-- Diary

-- Files & registers

-- Stock & accounts

-- Discussion with all members

CRP :

1. Diarrhoea Control Committee :

-- Meet with Upazila Chairman/U.N.O. and U.N. & FPO.

-- Meet with 4-5 members

2. Health Committee :

-- Meet with all Committee Heads

-- Arrange meeting

3. Male contact :

-- Meet with first 5 people of any village

-- Attend atleast one meeting

-- Follow-up 5 persons attended meeting earlier.

4. Dai.

-- Attending one Trg. for last 2 days.

-- 5% visit to trained Dai

-- Meet with some pregnant and lactating mother

-- Meet with Pt. treated by Dai

5. Gram Sebika :
   - -- Attending one Trg. from 3rd days
   - -- Meet with 5% trained Sebika
   - -- Meet with Pt. treated by Sebika
   - -- Checking of LGS use
   - -- Checking of other jobs performing by Sebika
6. Immunisation :
   - -- Client selection
   - -- Spot checking
   - -- Use of instruments & materials
7. Pt. care & follow-up :
   - -- Interview with 2-3 pts. already cared
8. School Forum :
   - -- Base village school visit
   - -- Furthest school visit
   - -- Attending school forum
9. Other forum :
   - -- Meet with Imam of base village mosque
   - -- Meet with village doctors
10. Supervision :
    - -- Diary check-up
    - -- Direct field supervision
    - -- Meeting with workers.

11. Management, administration and accounts :

-- Daily Roster

-- Files, registers, records

-- Stock & accounts

-- Discussion with all workers.

ব্র্যাক

বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি BRAC গ্রামীণ বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিবেদিত একটি বেসরকারী উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান। সমিতি নিবন্ধণ (রেজিষ্ট্রেশন) আইন ১৮৬০ এর অধীনে নিবন্ধিত এই প্রতিষ্ঠান ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য নবতর বাস্তবমুখী ধারণার প্রণয়ন ও প্রয়োগই ব্র্যাক-এর প্রধান কাজ।

এই উদ্দেশ্যে ব্র্যাক গ্রামের সুযোগবঞ্চিত দরিদ্র জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে বিভিন্ন পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে ভূমিহীনদের জন্য দলীয় উপার্জনশীল কর্মসূচী, গ্রামীণ ঋণ প্রকল্প, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, ডায়রিয়া প্রতিষেধক প্রকল্প, চেতনাদায়ী ব্যবহারিক শিক্ষা, মাসিক গণকেন্দ্র পত্রিকা, অংশগ্রহণমূলক গবেষণা, দরিদ্র কারুকারদের হস্তশিল্পজাত সামগ্রীর উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব কর্মসূচীর মাধ্যমে ব্র্যাক মূলতঃ গ্রামীণ জনগণকে তাদের অবস্থা এবং সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে নিজেদের উন্নতির জন্য তাদেরকে সংগঠিত করে আসছে।

ডায়রিয়া ও প্রতিষেধক স্যালাইন

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে অনুন্নত বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রাণসংহারী রোগই হচ্ছে ডায়রিয়া। এই রোগের পুনঃপুনঃ আক্রমণ মানুষকে পুষ্টিহীন এবং জীবন্মৃত্ও করে রাখে।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে ব্র্যাক এর সত্যতা লক্ষ্য করেছে। এখানে শিশুমৃত্যু ও অকাল মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণই হলো পুষ্টিহীনতা ও ডায়রিয়া। জীবিত প্রায় প্রতিটি শিশুই বছরে অন্ততঃ দু'বার আক্রান্ত হয় ডায়রিয়ায়।

যে কোন কারণে, সাথে বমি হোক বা না হোক, একবার পাতলা বা তরল পায়খানা হওয়াকে ডায়রিয়া বলা যায়। এতে শরীর থেকে পানি বেরিয়ে গিয়ে রোগীকে দুর্বল করে এক সময় তার মৃত্যু ঘটাতে পারে। এর প্রতিকার হিসাবে শিরার মাধ্যমে স্যালাইন দেবার ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য সব দেশের মতো আমাদের দেশেও রয়েছে। তবে তা সব এলাকায় সহজলভ্য নয়। এর বিকল্প হিসাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এক ধরনের মুখে খাবার স্যালাইন উদ্ভাবন করেছে যার মধ্যে আনুপাতিক হারে রয়েছে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড, বাইকারবোনেট ও গ্লুকোজ। এই মিশ্রণ প্যাকেটে করে বাজারজাত করতে হয়। এটা বাজার থেকে কিনে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে নিয়ে রোগীকে পান করতে হয়।

প্রায় এক বছরের গবেষণা ও পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর ব্র্যাক একটি কার্যকর, নিরাপদ, সহজলভ্য সামগ্রীর দ্বারা বাড়ীতে তৈরীযোগ্য ব্যবস্থা উদ্ভাবন করে। এটি ১ চিমটি লবণ, ১ মুঠো গুড়, আধসের বিশুদ্ধ পানির সাথে মিশিয়ে তৈরী করতে হয়। এটি এমন একটি পরিপূর্ণ দ্রবণ (সেলিউশন) যেখানে স্যালাইনের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান আনুপাতিক হারে রয়েছে। এই স্যালাইন

পান করে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগী দ্রুত সেরে উঠতে পারেন এবং তাৎক্ষণিক পুষ্টিহীনতার দুর্বলতা থেকে মুক্ত হতে পারেন। এই স্যালাইন শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া পানির ঘাটতি পূরণ করে এবং দ্রবীভূত গ্লুকোজ তার শক্তি যোগায়। এই সহজ মুখে খাবার স্যালাইন কার্যকর ও অনুপাত মাফিক তৈরীর ব্যাপারে ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক উদরাময়গ বেষণাগার যথেষ্ট কারিগরী পরামর্শ ও সহযোগিতা যুগিয়েছে।

ব্র্যাক-এর ডায়রিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচী

ডায়রিয়ার এই প্রকোপ এবং ভয়াবহতা উপলব্ধি করে নিজেদের উদ্ভাবিত মুখে খাবার সহজলভ্য সেলাইনের ভিত্তিতে ১৯৭৯ সালে প্রাথমিকভাবে সিলেট জেলার ২টি থানায় ব্র্যাক পরীক্ষামূলক ডায়রিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচী হাতে নেয়। এর মাধ্যমে ব্র্যাক কর্মীরা প্রকল্প এলাকায় এর প্রচারসহ প্রতিটি বাড়ীর অন্ততঃ একজন মহিলাকে এই স্যালাইন তৈরীর পদ্ধতি শেখান। দেখা গেছে এইসব মহিলারা সহজেই এই সেলাইন তৈরী করে ডায়রিয়া রোগীদের পরিচর্যা করতে পারেন।

এই অভিজ্ঞতার আলোকে ব্র্যাক ১৯৮০ সাল থেকে এই প্রকল্পকে একটি জাতীয় কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই কর্মসূচী আগামী ৩ বৎসরেরর মধ্যে সিলেট, যশোর, ফরিদপুর, খুলনা ও কুষ্টিয়া এই পাঁচটি জেলায় বিস্তৃত হয়ে প্রায় ২৫ লক্ষ বাড়ীর প্রতিটির অন্ততঃ একজন মহিলাকে এই পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তুলবে। পরবর্তীতে এই কার্যক্রম আরও বিস্তৃত হয়ে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে।

অন্যান্য সহায়ক কর্মসূচী

এই কর্মসূচীকে জোরদার এবং স্যালাইনের ব্যবহার ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে সহায়ক শক্তি হিসাবে থাকবে প্রচার কর্মসূচী। রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, পুস্তিকা, পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যকে ছড়িয়ে দেয়া হবে দেশ জুড়ে।

এছাড়াও কর্ম এলাকার প্রতিটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলকে এই কর্মসূচীর সাথে জড়িত করা হবে। এর মাধ্যমে স্কুলের শিক্ষক-ছাত্র-ছাত্রীরাও স্যালাইনের পরিচিতি এবং ব্যাপক ব্যবহারের জন্য কাজ করবেন। তাদেরকে আগ্রহী করে তোলার জন্য কর্মের ভিত্তিতে স্কুল এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা রয়েছে।

একই সাথে, এই কর্মসূচীকে চালু রাখার জন্য প্রতিটি গ্রামে স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে একটি করে কমিটি গঠিত হবে যারা এই স্যালাইনের প্রচার এবং ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

কর্মী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও বেতন

এই ডায়রিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচীর প্রস্তাব অনুযায়ী কর্মীরা (ও আর ডাব্লিউ) হবেন মহিলা। এদেরকে সংশ্লিষ্ট জেলা থেকেই সংগ্রহ করা হবে এবং সাধারণতঃ সেখানেই কাজ করতে হবে। তাঁদের নূ্যনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে মাধ্যমিক শ্রেণী পাশ এবং বয়স, ১৮র নীচে নয়।

প্রথমতঃ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন মারফত বা সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ইচ্ছুক কর্মীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহবান করা হবে। দরখাস্ত বাছাইয়ের এবং সাক্ষাৎকার পত্র পাঠাবার দায়িত্ব থাকবে এরিয়া অফিসের। সাক্ষাৎকারের পর প্রাথমিকভাবে মনোনীত প্রার্থীদের তার পরদিন থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। ৬ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে কেবলমাত্র সফল কর্মীদেরই নিয়োগপত্র দেয়া হবে।

নিয়মানুযায়ী ও আর ডাব্লিউদের প্রকল্প এলাকায় দলবদ্ধভাবে থাকতে হবে এবং যাবতীয় নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

এই কর্মীদের বেতন নির্দ্ধারিত হবে প্রত্যেকের কর্মসম্পাদনের ভিত্তিতে। কর্মীরা গ্রামের বাড়ী বাড়ী গিয়ে অন্ততঃ ১ জন মহিলাকে ডায়রিয়া সম্পর্কে মনে রাখার জন্য ১০টি পয়েন্ট এবং স্যালাইন তৈরীর পদ্ধতি শেখাবেন। মনিটরেরা এ কাজ কর্মীরা কতটুকু সফলতার সাথে সম্পন্ন করতে পেরেছে তা যাচাই করে দেখবেন এবং ক/খ/গ/ঘ এই চারটি গ্রেডে তা চিহ্নিত করবেন। ক গ্রেডের প্রতিটি কাজের জন্য কর্মীরা পাবেন ৪ টাকা হারে, খ গ্রেডের জন্য ২ টাকা হারে, গ গ্রেডের জন্য ১ টাকা হারে এবং ঘ গ্রেডের কাজের জন্য কর্মী কোন পারিশ্রমিক পাবেন না। এ হিসাবে দেখা গেছে কর্মীরা সাধারণতঃ মাসে ৬০০ টাকা বা তারও বেশী আয় করতে পারেন।

মুখে খাওয়ার স্যালাইন বানাবার নিয়ম

একটি পাত্রে আধসের পরিমাণ কলের বা ফুটানো ঠান্ডা পানি নিন। তিনটি আঙ্গুলের প্রথম ভাঁজের সমান এক চিমটি লবণ নিয়ে পাত্রের পানিতে ফেলুন।

এবার এক মুঠো গুড় নিন। হাতের বাইরের গুড়টুকু ছাড়িয়ে নিয়ে মুঠোর ভিতরের গুড়ের সবটাই ঐ পানিতে ফেলুন।

তারপর একটা পরিষ্কার চামচ দিয়ে তা নাড়তে থাকুন। লবণ আর গুড় পানিতে ভালোভাবে মিশে গেলে জানবেন আধসের মুখে খাবার স্যালাইন তৈরী হয়ে গেছে। এবার তা ডায়রিয়া রোগীকে খাওয়াতে পারেন।

বমি হয়ে গেলেও এ স্যালাইন খাওয়াতে হবে। সেই সাথে রোগীকে সাধারণ সব খাবারই খেতে দিতে হবে। রোগ সেরে যাবার পরও কমপক্ষে ৭ দিন রোগী বেশী পরিমাণে পানি এবং খাবার খাবেন।

মনে রাখবেন, রোগের প্রথম অবস্থায় ঘরে লবণ-গুড়-পানি দিয়ে তৈরী মুখে খাবার স্যালাইন বানিয়ে খাওয়ালে এ রোগ সেরে যায়, রোগী দুর্বল হয় না এবং শরীরে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

বাংলাদেশ সরকারের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীতে (ই,পি,আই) ব্র্যাকের শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচীর ভূমিকা

বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক) একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ব্র্যাক গত ১৯৭২ সাল থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উন্নয়ন ক্ষেত্রে জনগণকে স্বাবলম্বী করে তোলার মহান ব্রতকে সামনে রেখে ব্র্যাক বিভিন্নমূখী কর্মসূচী নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে জনগণের মাঝে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার নূ্যনতম ব্যবস্থা পৌছিয়ে দেবার জন্য শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচী হাতে নিয়েছে।

বাংলাদেশকে উচ্চ শিশু মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ব্র্যাক ১৯৮৬ সালে থেকে শুরু করে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এ কর্মসূচী চালিয়ে যাবে। শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচীর আওতায় দুটো প্রকল্প আছে, (১) ডায়রিয়া প্রতিষেধক, টিকাদান কর্মসূচী ও ভিটামিন এ ক্যাপসুল বিতরণ এবং (২) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা।

প্রথমোক্ত প্রকল্পের আওতায় দেশের সমগ্র উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে (রাজশাহী বিভাগ) এবং চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৮৬ সালের জুলাই থেকে ১৯৮৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ব্র্যাক পাবনা, বগুড়া, রংপুর, মানিকগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং রাজশাহী জেলার ১৭টি উপজেলায় ই,পি,আই কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার জন্য সরকারী স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের সাথে সহযোগিতা চালিয়ে যায়। ১৯৮৭ সালের জুলাই থেকে ১৯৮৮ সালের জুন পর্যন্ত ব্র্যাক নিম্নলিখিত উপজেলাগুলোতে সরকারী কর্মীদের সাথে সহযোগিতমূলক কর্মকান্ড চালিয়ে যাবে।

জেলা	উপজেলা
১। পাবনা	১। আটঘরিয়া
	২। বেড়া
	৩। চাটমোহর
	৪। সুজানগর
	৫। ফরিদপুর
২। সিরাজগঞ্জ	১। রায়গঞ্জ
	২। সাহাজাদপুর
	৩। উল্লাপাড়া
	৪। কামারখন্দ

৩। নওগাঁ	১। নওগাঁ সদর
	২। রানীনগর
	৩। আত্রাই
	৪। মান্দা
৪। দিনাজপুর	১। হাকিমপুর
	২। বিরল
	৩। চিরির বন্দর
	৪। পার্বতীপুর
	৫। বীরগঞ্জ
৫। বগুড়া	১। সারিয়াকান্দি
	২। আদম দিঘি
	৩। ধুপচাঁচিয়া
	৪। শিবগঞ্জ
	৫। সোনাতলা
৬। কক্সবাজার	১। রামু
৭। গাইবান্দা	১। ফুলছড়ি
	২। গাইবান্দা
	৩। গোবিন্দগঞ্জ
	৪। পলাশবাড়ী
৮। চিটাগাং	১। রাঙ্গুনিয়া
	২। রাউজান
	৩। পটিয়া
	৪। সীতাকুন্ডু
	৫। সাতকানিয়া
৯। রংপুর	১। পীরগাছা
	২। কাউনিয়া
	৩। মিঠাপুকুর
	৪। রংপুর সদর
১০। রাজশাহী	১। চারঘাট
	২। বাঘমারা
	৩। গোদাগাড়ি

১১। নাটোর

১। বাগাতি পাড়া
২। বড়াইগ্রাম
৩। গুরুদাসপুর
৪। লালপুর
৫। সিংড়া
৬। নাটোর

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার কর্মসূচীর আওতায় প্রথম দু'বছর মাত্র পাঁচটি উপজেলায় কাজ করা হবে। তবে উভয় প্রকল্পেই সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী থাকবে।

ই,পি,আই ১৯৯০ সালের ভিতর সারা বাংলাদেশকে ইউ,সি,আই-এর আওতায় আনার যে কর্মসূচী নিয়েছে তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে ব্র্যাক সরকারী কর্মীদের সাথে পরিপূরক হিসেবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। টিকাদান কর্মসূচী হলো একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। তার প্রয়োজন সব সময়ই থাকবে। ব্র্যাক একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসেবে কোন একটি এলাকায় দীর্ঘদিন থাকতে পারেনা। তাই এই কর্মসূচীকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য সরকারী কর্মীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে অনেকদিনের জমে পড়া টিকাদানযোগ্য শিশু এবং মহিলাদের টিকা প্রদান করার জন্য ব্র্যাক কর্মীরা সরকারী কর্মীদের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে।

শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচীর মাঝে প্রথমোক্ত প্রকল্পটিই অধিকতর ব্যাপক। এই প্রকল্পে টিকাদান কর্মসূচীর উপর কাজ করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের ব্র্যাকের নিম্নলিখিত কর্মী থাকবে।

জেলা পর্যায়ে :

একজন এরিয়া ম্যানেজার সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর কাজে সরকারী কর্মীদের সহযোগিতা যোগাবে। জেলা পর্যায়ে অফিস পুরো উপজেলার কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবে। তবে সম্ভাব্য অবস্থানের সময় হবে দু'বছর। যে সকল উপজেলায় এক বছর কাজ হয়ে গেছে সে সকল স্থানে এরিয়া ম্যানেজার মাঝে মাঝে যাবে এবং কর্মসূচীর খোঁজ খবর নিবে ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করবে।

উপজেলা পর্যায়ে :

উপজেলা পর্যায়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি টিম সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর জন্য এক বছর অবস্থান করবে। তাদের ভিতর একজন হবেন উপজেলা প্রোগ্রাম অর্গানাইজার (ইউ,পি,ও) তিনি সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকবেন। তারা সরকারী কর্মীদের কাজে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

ইউনিয়ন পর্যায়ে ঃ

টিকাদান কর্মসূচীর জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে সরাসরি কোন টিম থাকবে না। তবে তারবিরা শিক্ষাদানের উপর কাজ করার জন্য সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি টিম আট সপ্তাহব্যাপী একটি ইউনিয়নে অবস্থান করবে। মহিলা কর্মীরা মহিলাদের এবং পুরুষ কর্মীরা পুরুষদের টিকা প্রদানের উপকারিতা সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। সম্ভব হলে তারা রেজিষ্টার তৈরীর ব্যাপারে সরকারী মাঠ কর্মীদের সহায়তা করবে।

বিভিন্ন পর্যায়ে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীতে ব্র্যাকের কর্মকৌশল ঃ

জাতীয় পর্যায়ে ঃ

-- ই,পি,আই স্টিয়ারিং কমিটি মিটিং, মাসিক ই,পি,আই মিটিং এবং সাপ্তাহিক ই,পি,আই মিটিং-এ ব্র্যাক যথারীতি অংশগ্রহণ করে আসছে এবং কর্মসূচীর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেছে।

-- ই,পি,আই প্রশিক্ষণ সেলে ব্র্যাকের কয়েকজন উচ্চ পদস্থ প্রশিক্ষক বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজে সহযোগিতা যুগিয়ে আসছে।

-- ই,পি,আই কমিনিকেশন সেলের বিভিন্ন মিটিং এ ব্র্যাক কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

-- প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে সময়ে সময়ে ই,পি,আই সংক্রান্ত যে সমস্ত সেমিনার, কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, তাতেও ব্র্যাক প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে।

-- সময়ে সময়ে মাঠ থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রতিবেদনরূপে প্রকল্প পরিচালককে পাঠানো হয়।

-- সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে ব্র্যাকের মাঠ পর্যায়ের ম্যানেজারগণও 'মিড ল্যাবেল প্রশিক্ষণ' নিয়ে থাকে।

জেলা পর্যায়ে ঃ

-- জেলা পর্যায়ে ই,পি,আই ওয়ার্কশপকে সফল করে তোলার জন্য ব্র্যাক কর্মীগণ জেলা পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে কাজ করে থাকে।

-- জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাদের সাথে ব্র্যাক কর্মীরা সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় রাখে।

-- উপজেলায় প্রাপ্ত ই,পি,আই সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি জেলা পর্যায়ের ব্যবস্থাপক, ইউনিসেফ এবং বিভাগীয় অপারেশনাল অফিসারের সাথে বিনিময় করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে ঃ

-- উপজেলায় পৌঁছার পর পরই ব্র্যাক কর্মীগণ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাদের সাথে একটা কর্মময় সম্পর্ক গড়ে তোলে।

-- উপজেলার বিভিন্ন ডেমোগ্রাফিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করে।

-- উপজেলা ই,পি,আই ওয়ার্কশপকে সফল করে তোলার সকল প্রকার প্রস্তুতিমূলক কাজে সহায়তা করে।

-- উপজেলা ই,পি,আই ওয়ার্কশপ চলাকালীন সময়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

-- উপজেলা ই,পি,আই বাস্তবায়ন কমিটি গঠনে সহযোগিতা করে।

-- উপজেলা ওয়ার্কশপে ই,পি,আই কর্মসূচী প্রণয়নের বিভিন্ন ধাপে ব্র্যাক কর্মীরা সহযোগিতা যোগায়।

-- উপজেলা পর্যায়ের সরকারী বেসরকারী, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাঝে ই,পি,আই কর্মসূচীকে তুলে ধরার কাজেও ব্র্যাক বিরাট ভূমিকা রেখে আসছে।

-- উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের প্রশিক্ষণে সহায়তা করা।

-- ইউনিয়ন পর্যায়ে ই,পি,আই কার্যাবলীর আলোকে কর্মসূচীর উন্নয়নমূলক তথ্য প্রদান করা হয়।

ইউনিয়ন পর্যায়ে ঃ

-- ইউনিয়ন ই,পি,আই বাস্তবায়নকমিটি গঠন করা।

-- ইউনিয়ন পর্যায়ে এ্যাডভোকেসী মিটিং করা।

-- ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন মিটিং করা।

-- ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সুপারভাইজারী কর্মীদের সাথে সার্বক্ষণিক কর্মময় সম্পর্ক বজায় রাখা।

-- ইউনিয়ন পর্যায়ের জনগণকে টিকা দেবার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা।

ওয়ার্ড পর্যায়ে :

-- ওয়ার্ডের চারটি ব্লকে স্বেচ্ছাসেবী নির্বাচনে সহযোগিতা করা।
-- রেজিস্টার করার ব্যাপারে সহযোগিতা করা।
-- টিকা প্রদান কেন্দ্র নির্বাচনে সহযোগিতা করা।
-- টিকা গ্রহণের জন্য জনমত গড়ে তোলা।
-- টিকা প্রদান কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করা।
-- টিকা প্রদানের পর ফলোআপ কাজে সহযোগিতা করা।
-- টিকা প্রদানজনিত ইনফেকশন কেইসগুলোর চিকিৎসা করার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র যোগাযোগ রাখা।

টিকা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ :

ব্র্যাক কর্মীদের একটি বিশেষ কাজ হলো টিকা গ্রহণে পুরুষ এবং মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করা। এই কাজে ব্র্যাক বিভিন্ন ফোরাম, সেমিনার, ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রভৃতি মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে।

শহর এলাকার (পৌরসভা) টিকাদান কর্মসূচীতে ব্র্যাকের অংশগ্রহণ :

পৌরসভা এলাকায় টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার জন্য ব্র্যাক কিছু সংখ্যক পৌরসভা এলাকায় সরকারী কর্মকান্ডের সাথে সহযোগিতা করে যাবে।

ধন্যবাদ।

রেডিও বার্তা

স্বামী ঃ (ঘরে ঢুকতে ঢুকতে) মিন্টু ও মিন্টু ----------

স্ত্রী ঃ এসেছ ? সকাল থেকে ছেলেটার কয়েকবার পাতলা পায়খানা হয়েছে।

স্বামী ঃ দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। তুমি এক্ষুনি ওকে খাবার স্যালাইন বানিয়ে খাইয়ে দাও।

স্ত্রী ঃ খাবার স্যালাইন ?

স্বামী ঃ হ্যাঁ, তিন আংগুলের প্রথম ভাঁজের সমান এক চিমটি লবণ, একমুঠ গুড় অথবা একমুঠ চিনি আধাসের খাবার পানিতে মিশিয়ে এ স্যালাইন বানাতে হয়। যাও তাড়াতাড়ি বানিয়ে নিয়ে এসো।

স্ত্রী ঃ আচ্ছা।

মিউজিক

স্ত্রী ঃ এই যে ধর স্যালাইন। আধাসের খাবার পানিতে তিন আংগুলের প্রথম ভাঁজের সমান এক চিমটি লবণ আর একমুঠ গুড় মিশিয়েছি - ঠিক আছে না ?

স্বামী ঃ হ্যাঁ।

স্ত্রী ঃ এবার খাইয়ে দিই।

স্বামী ঃ অবশ্যই মনে রাখবে প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর বড়দের আধাসের পরিমাণ খাবার স্যালাইন এবং বাচ্চা যতটুকু খেতে চায় তাকে সেই পরিমাণ খাবার স্যালাইন খেতে দিতে হবে। তবে বাচ্চাদের বারে বারে স্যালাইন খাওয়ানো দরকার। রোগীকে স্বাভাবিক সব খাবারও খেতে দিতে হবে। একবার বানানো স্যালাইন ছয়ঘন্টা পর্যন্ত রাখা যায়। তারপরেও প্রয়োজন হলে আবার নতুন করে বানিয়ে নিতে হবে। লবণ গুড় অথবা চিনি ও পানির তৈরী এই স্যালাইন ডায়রিয়ার সবচেয়ে সহজ ও নিরাপদ চিকিৎসা।

ব্র্যাক।

রেডিও বার্তা

F : ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা হলে রোগীকে খাবার স্যালাইন-এর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ পানি, ভাত, ডাল, মাছ ও সব তরকারী খেতে দিন। এটা অত্যন্ত জরুরী।

M : ডাক্তারী মতে রোগীকে এধরনের খাবার খেতে দিলে তা হজম করতে অসুবিধা তো হয়ই না, বরং তা রোগীকে সবল ও সতেজ রাখে এবং ডায়রিয়া দ্রুত সেরে যায়।

F : বড়দের প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর আধাসের পরিমাণ খাবার স্যালাইন এবং বাচ্চারা যতটুকু খেতে চায় তাকে সেই পরিমাণ খাবার স্যালাইন খেতে দিন। স্যালাইন ছয়ঘন্টার বেশী রাখবেন না।

M : বাচ্চাদের বেলায় মায়ের বুকের দুধ বা অন্যান্য স্বাভাবিক খাবার খাইয়ে যেতে হবে। ডায়রিয়া সেরে গেলেও হারানো শক্তি ফিরে পেতে রোগীকে কমপক্ষে সাতদিন একটু বেশী পরিমাণ খাবার খেতে দিন। এতে রোগীর পুষ্টিহীনতা ও দুর্বলতা দূর হবে।

F পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা থাকুন
ডায়রিয়া প্রতিরোধ করুন
ব্র্যাক।

রেডিও বার্তা

ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা একটি মারাত্মক রোগ, অথচ কিছু নিয়ম মেনে চললে এই রোগের আক্রমণ ও বিস্তার রোধ করা সম্ভব। বাসি-পচা, খাবার কখনো খাবেন না। খাবার জিনিস সবসময় ঢেকে রাখবেন যাতে মাছি বসতে না পারে। খাবার আগে অবশ্যই সাবান বা পরিস্কার পানি দিয়ে হাত মুখ ধোবেন। পায়খানার পর এবং বাচ্চাদের পায়খানা ফেলে ধোয়ানোর পর সাবান বা ছাই দিয়ে ভাল করে হাত ধোবেন। পানি সবসময় ফুটিয়ে খাবেন অথবা টিউবওয়েলের পানি খাবেন। থালাবাসন ধোয়াসহ ব্যবহারের সব পানি বিশুদ্ধ হওয়া দরকার। আপনার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াবেন। এতে শিশুর ডায়রিয়া হবার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে।

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন
ডায়রিয়া প্রতিরোধ করুন।
ব্র্যাক।

টেলিভিশন বার্তা

ডায়রিয়া কিংবা কলেরা হলেই রোগীকে খাবার স্যালাইন খেতে দিন। খাবার স্যালাইন ডায়রিয়া এবং কলেরার সবচেয়ে সহজ চিকিৎসা।

আমাদের খাবার পানির সংগে তিন আংগুলের প্রথম ভাঁজের সমান এক চিমটি লবণ ও একমুঠ গুড় অথবা একমুঠ চিনি মিশিয়ে এ স্যালাইন সহজেই তৈরী করা যায়।

কারো পাতলা পায়খানা শুরু হলেই তাকে এ স্যালাইন বারবার খাওয়াতে হবে।

সেই সাথে রোগীকে স্বাভাবিক সব রকম খাবার খেতে দিন।

শিশুদের বেলায় মায়ের বুকের দুধও অবশ্যই খাওয়াতে হবে।

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন
ডায়রিয়া প্রতিরোধ করুন
ব্র্যাক।

টেলিভিশন বার্তা

M বন্যা ও বন্যাপরবর্তী সময়টাতেই সবচেয়ে বেশী ডায়রিয়া ও কলেরা হয়। তাই নদী-নালা, খাল-বিলের পানি কখনো খাবেন না।

F টিউবওয়েলের পানি খান তা নিরাপদ। টিউবওয়েলের পানি না পেলে কলসীতে পানি পরিস্কারের ট্যাবলেট বা ছোট এক টুকরো ফিটকিরি দিয়ে রাখুন এবং সেই পানি খান। সম্ভব হলে পানি ফুটিয়ে খাবেন।

M থালাবাসন ধোয়াসহ ব্যবহারের সব পানিই বিশুদ্ধ হওয়া দরকার। যেখানে সেখানে বিশেষতঃ পানির কাছাকাছি কাউকে মল ত্যাগ করতে দেবেন না।

F ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা শুরু হলে রোগীকে সংগে সংগে খাবার স্যালাইন খেতে দিন এবং বারবার খাওয়ান।

M আধাসের খাবার পানির সাথে তিন আংগুলের প্রথম ভাঁজের সমান এক চিমটি লবণ ও একমুঠি গুড় অথবা চিনি মিশিয়ে এ স্যালাইন সহজেই তৈরী করা যায়।

F রোগীকে খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি সব ধরণের খাবারই খেতে দিন। শিশুকে অবশ্যই মায়ের বুকের দুধ খাওয়াবেন।

M পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন
ডায়রিয়া প্রতিরোধ করুন।
ব্র্যাক।

H4OTEP:82F(3)/OP-1

HSA--A

ORAL THERAPY EXTENSION PROGRAMME (OTEP)

ORW's Monthly Salary Calculation Sheet

BRAC

ORW's Name :

Month :

Monitoring Grade	No. of household monitored per Grade	Total household monitored	% of household monitored per Grade	Total households visited during the month	No. of household Per Grade	Payment for each household per Grade	Total Payment Grade wise
A							
B							
C							
D							
Sub-Total							Tk
Fringe benefit							Tk
Deduction (if							Tk
any)							Tk

Total : Taka

Certified by

Recipient's Signature

Area Manager

B4OTEP82R(3)/OP-1

1993–1
ORW
CODE No.
TEAM No.
PERIOD :

ORAL THERAPY EXTENSION PROGRAMME (OTEP)

ORW ACTIVITY MONITORING FORM

BRAC

OBSERVE .... OF THE FOLLOWING (no)

Sl. No	Learner' name	Name of Head of Household (HH)	Learner's relationship with HH	Para	Village	Union	What is the first symptom of diarrhoea (1)	When loose motion turns into diarrhoea (1)	Treatment (LGS, water & normal diet) (1)	When to begin & why (1+1)	How much (1+1)	Prevention (1)	Nutrition (1+1)	Total correct	LGS-Practical preparation	Grade	Sample visit number	Water Measurement (in ...)	Name of Youngest child	Monitor (Code No.)
1.																				
2.																				
3.																				
4.																				
5.																				

KEY :

Nos. 1—7: Number in the bracket indicates alloted marks.
9. Lobon-Gur-Saline ; C = Correct, N = Not correct; O = No knowledge

GRADES

A = 10 marks and LGS Correct; B = 7 to 9 $\frac{1}{2}$ marks and LGS correct;
C = less than 7 marks and LGS correct, D = LGS incorrect

Grading Abstract			
A	B	C	D

turn over .....

[illegible]

শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচী

[illegible] স্বাস্থ্যকর্মীর কার্যক্রম [illegible]

BRAC

জেলা : গ্রাম :

ক্রমিক সংখ্যা	স্বাস্থ্য কর্মী	গ্রাম	[illegible]	ঔষধ সমূহ									লবণ সামগ্রী		মন্তব্য
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
১															
২															
৩															
৪															
৫															
৬															

[illegible] :

এলাকা ব্যবস্থাপক :

তারিখ :

HIOTEP 82P(3)/Op-1

সংযোজনী ১৭

শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচী

খানার সাপ্তাহিক পরিদর্শনের মাসিক পরিসংখ্যান

BRAC

এলাকা: জেলা: মাস:

কর্মএলাকাভুক্ত ইউনিয়ন	গ্রাম	স্বাস্থ্য কর্মী সংখ্যা	স্বাস্থ্য কর্মীর কর্মদিবস	শিক্ষা প্রাপ্ত মোট খানার সংখ্যা	মাস শেষে শিক্ষাপ্রাপ্ত রিভিজিটেড খানার সংখ্যা	মোট খানায় মোট শিক্ষাপ্রাপ্ত খানায় পর্যবেক্ষিত খানার সংখ্যা	পর্যবেক্ষণ মান				পর্যবেক্ষিত খানার মানের হার				শিক্ষা প্রদানের গড় খানা/ স্বাস্থ্য কর্মী	চলতি শিক্ষা প্রদানের গড় খানা/ স্বাস্থ্য কর্মী	মন্তব্য
							ক	খ	গ	ঘ	ক	খ	গ	ঘ			
মোট																	
এলাকা ভিত্তিক ত্রৈমাসিক মোট																	

এলাকা ব্যবস্থাপক

তারিখ:

সময় কাল ১৯৮০-১৯৯০

বিষয়	১ম ধাপ ওটেপ	২য় ধাপ ওটেপ	৩য় ধাপ সি.এস.পি	মোট
১ । জেলা (বৃহত্তর)	৫	৮	৭	২০
২ । উপজেলা	১১৩	১৬৮	১৪২	৪২৩
৩ । ইউনিয়ন	১১৫৯	১৭১০	১৩৮৫	৪২৫৪
৪ । গ্রাম	২০৬৬৮	২৬৯২২	২৮৪০২	৭৫৯৯২
৫ । শিক্ষাপ্রাপ্ত বাড়ীর সংখ্যা	২৫১২৭৪৬	৪৯৮৩৭৯৩	৪২৯৬১১৫	১১৭৯২৬৫৪
৬ । মনিটরিংকৃত মায়ের সংখ্যা	১৬৯৭৮৮	২০৪২৮৮	৭৩৭৮১	৪৪৭৮৫৭
৭ । গ্রেডকৃত মা				
এ	৪৯.৫০	৫৪.৩০	৫০.০৪	
বি	৪৭.৫৬	৪৪.২৫	৪৪.৫৫	
সি	২.১২	১.২৫	৫.০৬	--
ডি	০.৮২	০.২০	০.৩৫	
৮ । ব্যবহারের হার	৩৫%	৪৬.৯%	৪৮.৪%	--
৯ । স্যাম্পল বিশ্লেষণ ঃ				
ক্লোরাইড	৯৬৪০৬	১৭২৭৫০	৬৩৩৫৬	৩৩২৫১২
সোডিয়াম	২০৭১	৯৭১	৪৫৪	৩৪৯৬
পটাশিয়াম	২০৭১	৯৭১	৪৫৪	৩৪৯৬
গ্লুকোজ	১৭৫৮	৮৫০	৪৫৪	৩০৭২
১০ । ক্লোরাইড কনসেনট্রেশন				
৩০ এর নীচে	.৯৯	১.৪	১.৯৭	
৩০-৯৯	৯১.৩৯	৯০.৫	৮৯.১৫	
১০০-১১৯	৫.৩৯	৫.৭	৫.৮২	--
১২০$^{+}$	২.২৩	২.৪	৩.০৬	
১১ । রোগীর যত্ন	৯৫,০০০	২০২৫৫১	১৩০০৫৫	৪২৭৬০৬

১২। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা	৬৮৬৪	১২৬৩৪	৯৭৬৭	২৯২৬৫
১৩। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা	১২৩৯	২৭৪৯	২৫৯১	৬৫৭৯
১৪। ছাত্রদের শেখানো	৬২২০০০	১২৯০৫৮০	১০০০৯৯৮	২৯১৩৫৭৮
১৫। কর্মী সংখ্যা	১০৭৮	১২৫০	১৩২৫	
ও.আর.ডাব্লিউ	৬০৮	৬৭৯	৪৫১	
পি.ও	৩০০	৩৯৫	৫৪০	--
এরিয়া ম্যানেজার	১০	১১	২৭	
হিসাবরক্ষক	১০	১১	২৭	
ল্যাব সহকারী	১০	৫	৩	
অফিস সহকারী	১০	১১	২৭	
পাচক	১৩০	১৩৮	২৩৪	
মেডিক্যাল অফিসার	--	--	১৬	
১৬। বাজেট	৩৫৮৮৯২৩০	৯৪৫৬০৬৩২	২৭৪৪৩৯৬৮৫	৪০৪৮৮৯৫৪৭
১৭। টিটি (২ ডোজ)	--	১৬৫৩৭৩	--	১৬৫৩৭৩
১৮। ধাত্রী প্রশিক্ষণ	--	৯০০০	৫১৯৪	১৪১৯৪
১৯। সেবিকা প্রশিক্ষণ	--	২৬৯১৩	২৫০	২৭১৬৩
২০। ৭ পয়েন্ট স্ক্রিপ্ট	৪২৯০০০	৯০০০০০	১০০০০০০	২৩২৯০০০
২১। পোস্টার বিতরণ	১৩৮০০০	২৫০০০০	৩২৫০০০	৭১৩০০০
২২। ফোল্ডার বিতরণ	১২১০০০	১০২০০০	১১৫০০০	৩৩৮০০০
২৩। রেডিও স্পট	৬০০	২৩০৫	২৫৬০	৫৪৬৫ *
২৪। টিভি স্পট	১২২	১১৮৭	১৩৫০	২৬৫৯ *

* রেডিও এবং টিভিতে প্রচারিত স্পটের সংখ্যা কিছুটা অনুমান নির্ভর। কারণ এর উপর রিপোর্টিং ফাইলটি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

পাইলট প্রকল্পে যারা জড়িত ছিলেন

সময়কাল : জুলাই, ১৯৭৯ - মে, ১৯৮০

	নাম	পদবী
১.	ফজলে হাসান আবেদ	নির্বাহী পরিচালক
২.	সুখেন্দ্র কুমার সরকার	প্রকল্প প্রশাসক, শাল্লা প্রকল্প
৩	Tedd Ellerbrock Vincent	Medical officer, শাল্লা প্রকল্প
৪.	মুশফিকুর রব চৌধুরী	প্রকল্প ব্যবস্থাপক
৫.	মনোরঞ্জন সরকার	সহকারী মেডিকেল অফিসার, শাল্লা প্রকল্প
৬.	আজিজুল করিম	ক্যাম্প-ইন-চার্জ শাল্লা প্রকল্প
৭.	শাহাবুদ্দিন	"
৮.	হালিম চৌধুরী	"
৯.	আবুবকর সিদ্দিক	টিম-কো-অর্ডিনেটর
১০.	কামরুল ইসলাম	"
১১.	ফজলুল করিম	"
১২.	রতিকা সরকার	মনিটর
১৩.	শাহাদাত হোসেন	"
১৪.	প্রণব দাস	"
১৫.	জয়নাল আবেদীন	"
১৬.	হেমলতা সরকার	ও.আর.ডাব্লিউ
১৭.	কামরুন্নাহার	"
১৮.	শামসুন্নাহার	"
১৯.	গোপা দে	"
২০.	ঝর্ণা দাসগুপ্ত	"
২১.	পূর্ণিমা পাল	"
২২.	সুরুচী বালা শীল	"
২৩.	সন্ধ্যা ভট্টাচার্য	"
২৪.	শিলা দাস	"
২৫.	আরতি তালুকদার	"
২৬.	নার্গিস	"
২৭.	জেসমিন সিদ্দিকী	"
২৮.	নুরুন্নাহার	"
২৯.	মীরা চক্রবর্তী	"
৩০.	রীতা রায়	"
৩১.	মুকুল	"
৩২.	নীলিমা রায়	"
৩৩.	চঞ্চলা পাল	"
৩৪.	রিতা চক্রবর্তী	"
৩৫.	বেলী দে	"
৩৬.	মিরা নন্দী	"
৩৭.	সুপ্রভা দাস	

The Technical Advisory Committee (TAC)

1. Dr. Richard A. Cash M. D., M.P.H.
   Coordinator, International Health Programs,
   Harvard School of Public Health,
   Boston, Mass., U.S.A.

2. Dr. Stan D'Souza Ph.D.
   Scientific Program Head,
   International Centre for Diarrhoeal Disease Research,
   Bangladesh (ICDDR,B), Dhaka.

3. Dr. W. B. Greenough III, M.D.
   Director
   International Centre for Diarrhoeal Disease Research,
   Bangladesh (ICDDR,B), Dhaka.

4. Dr. Monowar Hossain, Ph.D.
   Chairman
   Bangladesh Institute of Development Studies
   Dhaka

5. Dr. Anthony R. Measham, M.D., Dr. P.H.
   Program Officer,
   Ford Foundation
   Dhaka

6. Dr. M. Q-K. Talukder, M.B.B.S., M.R.C.P., Ph.D.
   Associate Professor of Pediatrics,
   Institute of Post-Graduate Medicine and Research
   Dhaka